পেন্সিলে আঁকা পরী

হুমায়ূন আহমেদ

সূচিপত্র

পেন্সিলে আঁকা পরী 3
মুখে মেকআপ নিয়ে রেশমা বসে আছে....................28
ফ্লোরে ফিরে রেশমা হতভম্ব হয়ে গেল 39
মোবারক সাহেবের হোটেলের ঘর....................57
রেশমা ক্যান্টিনে চা খেতে ঢুকেছে....................74
মোবারক সাহেবের খাস কামরা 97
ঝুমুর আজ স্কুলে যায় নি 113
আজমল তরফদার....................136
বাড়িওয়ালা চাচা নিজামউদ্দীন 148
প্রেম দেওয়ানার ডাবিং....................171
ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে চিঠি 193
ঝুমুরদের রান্নাঘর বারান্দায়....................219
মাগরিবের নামযের পর 242

মোবারক সাহেবের কুঁড়েঘর......254
কোমল সেই হাত......261

পেন্সিলে আঁকা পরী

মোবারক সাহেবের গলার স্বর ভারি ও খসখসে।

কোমল করে কিছু বলতে গেলে স্বর আরো ভারি হয়ে যায়। তবু তিনি চেষ্টা করলেন কোমল করে কিছু বলতে। মেয়েটার সঙ্গে শুরুতে একটু ভাব করে নেয়া দরকার। অল্প বয়সী মেয়ে–গলা শুনেই যেন ঘাবড়ে না যায়। কী বলা যায়? নাম জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। যে-কোনো কথোপকথন নাম জানার মাধ্যমে শুরু হতে পারে।

রাত এগারটা। মেয়েটি এবং তিনি বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছেন। অথচ তিনি তার নাম জানেন না। বেশ মজার ব্যাপার। মেয়েটিও নিশ্চয়ই তার নাম জানে না। নাকি জানে? এ জাতীয় মেয়েরা তলে তলে খুব চালাক চতুর হয়। নামধাম সব জেনে নিয়েছে হয়তো।

মোবারক সাহেব হাসির মতো ভঙ্গি করে বললেন, তোমার নাম কী?

মেয়েটি রিনারিনে গলায় বলল, টেপী।

কী নাম বললে?

টেপী। ট-একারে টে, প ঈ-কারে পী–টেপী।

মোবারক সাহেব গভীর গলায় বললেন, ফাজলামি করছি নাকি?

ফাজলামি করব কেন? নাম জিজ্ঞেস করেছেন, নাম বললাম।

মেয়েটা হাসছে। ঝনঝনি শব্দে হাসছে। মোবারক সাহেব উঁচু গলায় বললেন, সত্যি তোমার নাম টেপী?

হুঁ। আমার বড় বোনের নাম হ্যাঁপী। তার সঙ্গে মিলিয়ে আমার নাম টেপী।

আবারো খিলখিল হাসি। মেয়েটার গলার ভেতর কি একগাদা কৃস্টালের টুকরা রেখে দেয়া? হাসলেই ঝন ঝন শব্দ। নাকি এই বয়সের মেয়েরা এ রকম করেই হাসে!

মোবারক সাহেবের ধারণা হলো, মেয়েটা তাঁর সঙ্গে ফাজলামি করছে। পুচকা একটা মেয়ে ফাজলামি করছে, ভাবাই যায় না। মেয়েটার বয়স কত? কুড়ি-একুশ, নাকি তারচেয়ে কম?

মেয়েটি ফাজলামি করছে কিনা নিশ্চিত হওয়া দরকার। কীভাবে নিশ্চিত হবেন। মোবারক সাহেব বুঝতে পারছেন না। হ্যাঁপীর সঙ্গে মিলিয়ে টেপী নাম কেউ রাখলে রাখতেও পারে। লো-ক্লাস ফ্যামিলিতে নাম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। প্রথম বাচ্চাটার নাম ঠিকঠাক মতো রাখে; তারপর উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

তোমরা কি দুই বোন?

না, তিন বোন।

তৃতীয় বাােনের নাম কী?

পেপী।

মোবারক সাহেব থমথমে গলায় বললেন, তৃতীয় বাােনের নাম পেপী?

জ্বি। বোনদের নাম মিলিয়ে রাখতে হয়। নাম মিলিয়ে না রাখলে বেহেশতে বোনে বোনে দেখা হয় না।

তুমি পড়াশুনো কতদূর করেছ?

ক্লাস ফাইভ।

কথাবার্তা শুনে তো মনে হয় ক্লাস ফাইভের চেয়ে বেশি পড়েছ এবং আমার ধারণা তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করছ।

আপনি মুরব্বি মানুষ। আপনার সঙ্গে রসিকতা করব কেন?

তিনি বাতি জ্বালালেন।

বাতি জ্বলামাত্র মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, বাতি নেভান, বাতি নেভান। গায়ে কাপড় নাই। তিনি বাতি নিভিয়ে দিলেন। টেপী সঙ্গে সঙ্গে বলল, এখন জ্বলেন। কাপড় পরেছি।

তিনি বাতি জ্বালালেন না। হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পের কাছে রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিলেন। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরালেন। লাইটারের আলোয় মেয়েটিকে দেখার ইচ্ছা করছিল, সেই ইচ্ছা দমন করলেন। তিনি সূক্ষ্ম এক ধরনের অস্বস্তি বোধ

করছেন। মেয়েটির কোনো একটা ব্যাপার তার পছন্দ হচ্ছে না। সেটা যে কী তাও বুঝতে পারছেন না। মেয়েটির চুল থেকে কোনো রিপালসিভ গন্ধ কি আসছে? কিং শাড়ি থেকে ন্যাপথলিনের ঘাণ? এইসব মেয়েরা তাদের ভালো শাড়িগুলোর ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন দিয়ে রাখে। যেন পোকায় কেটে শাড়ি নষ্ট না করে।

সিগারেট টেনে তিনি আরাম পাচ্ছেন না। তামাকের গন্ধটা অনেক কড়া লাগছে। বমি বমি লাগছে। সিগারেট ফেলে দিতে হবে। টেবিল ল্যাম্পের কাছে অ্যাশট্রে থাকে, আজ নেই। হাউসকিপিং ঠিকমতো হচ্ছে না। তিনি খাট থেকে নামলেন। টেপী সঙ্গে সঙ্গে বলল, কোথায় যান?

তিনি জবাব দিলেন না। অন্ধকারেই বাথরুমে ঢুকলেন। বাথরুমের বাতি জ্বালালেন। আয়নায় নিজেকে দেখলেন। যতটা না বয়স তারচেয়েও কি বেশি দেখাচ্ছে? তাঁর বয়স তিপ্পান্ন, আয়নায় একজন বুড়ো মানুষকে দেখা যাচ্ছে। তিনি জ্বলন্ত সিগারেট কমোডে ফেলে দিলেন। ফ্লাশ টানলেন। পানির সঙ্গে সিগারেট চলে গেল না। ভাসতে থাকল। মুখে পানি ছিটিয়ে টাওয়েল হাতে শোবার ঘরে ঢুকলেন। শোবার ঘরের প্রধান সুইচটি টিপে দিলেন। একসঙ্গে তিনটি বাতি জ্বলে ঘরটাকে ঝলমলে করে ফেলল।

মেয়েটি তাকে মিথ্যা বলেছে। সে কাপড় পরে নি। গলা পর্যন্ত চাদর টেনে শুয়ে আছে। কৌতুহলী চোখে তাকে দেখছে। মেয়েটা দেখতে ভালো। বয়সের নিজস্ব সৌন্দর্য ছাড়াও বাড়তি কিছু তার মধ্যে আছে। রং শ্যামলা। রং শ্যামলা বলেই চোখের কাজল এত সুন্দর লাগছে। কাটা কাটা নাক-মুখ। মেয়েটির চুল বেণি করা ছিল, এখন নেই। এক ফাঁকে নিশ্চয়ই খুলেছে। কখন খুলল?

টেপী বলল, আপনার কি শরীর খারাপ করেছে? তিনি জবাব দিলেন না, তবে প্রশ্নটা শোনার পর থেকে তাঁর শরীর একটু খারাপ লগতে লাগল। মাথা ঝিম ধরে আছে। বমি ভাবটা যায় নি। তিনি শোবার ঘরের জানালার দিকে এগুলেন–একটা জানোলা খুলে দিতে হবে। ঘরে বিশুদ্ধ কিছু বাতাস ঢুকুক। এয়ারকুলার চলছে বলে সব ক'টা জানালা বন্ধ। সিগারেটের ধোয়া ঘরে আটকে আছে। সিগারেটের ধোঁয়া যত বাসি হয় তার উৎকট ভাব ততই বাড়ে। জানালার পাশে তাঁর ফ্রিজার। শোবার ঘরে কেউ ফ্রিজার রাখে না। তিনি রেখেছেন। তাঁর খুব ঘনঘন পিপাসা হয়। তখন বরফশীতল পানি খেতে হয়। এই ফ্রিজারটা ভালো, পানি রাখামাত্র ঠাণ্ড হয়। জানালা না খুলে তিনি তাঁর ফ্রিজারের দরজা খুললেন।

এখন তাঁর কোনো পিপাসা হয় নি। তবু ঠিক করলেন আধগ্লাস পানি খাবেন–এতে যদি অস্বস্তি ভাবটা কাটে। তিনি পানির বোতল বের করলেন। ফ্রিজারের উপর দু'টা পানির গ্লাস থাকার কথা-তাই আছে। তিনি গ্লাসে মেপে মেপে আধাগ্রাস পানি ঢাললেন। বেশিও না, কমও না।

মেয়েটি বলল, কী খান? মদ?

মোবারক সাহেব সহজ গলায় বললেন, না, পানি খাই।

আমি ভাবছিলাম মদ।

মেয়েটি আবার হাসছে। না, হাসি সুন্দর। ঝনঝনে শব্দটা শুনে ভালো লাগছে।

মোবারক সাহেব কখনো এক চুমুকে পানি খান না। গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দেন। আজ এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে বললেন, তোমার নাম হচ্ছে টেপী, তাই তো?

জ্বি।

শোন টেপী, তুমি বাসায় চলে যাও।

টেপী অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। তার ভুরু কুঁচকে গেছে। এতক্ষণ সে শুয়ে ছিল, এখন আধশোয়া হয়ে বসল।

বাসায় চলে যাব?

হ্যাঁ।

আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?

রাগ করি নি। তুমি কাপড় পর, কাপড় পরে বাসায় চলে যাও।

এত রাতে বাসায় কীভাবে যাব?

ড্রাইভার আছে। ড্রাইভার তোমাকে পৌঁছে দেবে। অসুবিধা হবে না। তুমি থাক কোথায়?

অনেক দূরে থাকি। জয়দেবপুর।

ড্রাইভারকে বললেই হবে।

মোবারক সাহেব লক্ষ করলেন মেয়েটার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন। সে চাদরের নিচেই ব্লাউজ পরার চেষ্টা করছে। ফুলতোলা চাদর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে। মেয়েটাকে ভালোমতো কাপড় পরার সুযোগ দেয়ার জন্যেই তার এ ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। তিনি গেলেন না। এদের প্রশ্রয় দেয়ার কোনো কারণ নেই। স্ট্রিটগার্লদের স্ট্রিটগার্লের মতোই 'ট্রিট' করা উচিত। মেয়েটাকে অবশ্যি স্ট্রিটগার্লের মতো দেখাচ্ছে না। ভদ্র পরিবারের আহ্লাদী মেয়ের মতো লাগছে। কে জানে মেয়েটা হয়তো এই জীবনেই সুখী।

তোমার ঐ জয়দেবপুরের বাসায় কে থাকেন? তোমার বাবা-মা?

মেয়েটি চাদর দাঁত দিয়ে চেপে ধরেই কথা বলছে। কথাগুলো অস্পষ্ট এবং জড়ানো শোনা যাচ্ছে। সে বলল, মা থাকে আর আমার ছোট মামা।

বাবা কি মারা গেছেন?

না, বাবা আমাদের সঙ্গে থাকে না।

বোন দু'জন থাকে? হ্যাঁপী এবং পেপী?

হুঁ।

তোমার ভালো নাম কী?

আমার একটাই নাম। আচ্ছা। আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?

মোবারক সাহেব জবাব দিতে গিয়েও জবাব দিতে পারলেন না, একটু চমকে উঠলেন। কারণ মেয়েটি চাদর ফেলে দিয়েছে। ব্লাউজ সে ঠিকমতো পরে নি। বোতাম লাগানো হয় নি। ব্লাউজের নিচে কাঁচুলি নেই। গভীর আমন্ত্রণের ছবি। সে বলল, এত রাতে বাসায় গেলে আমার খুব অসুবিধা হবে। আমি বলে এসেছি। সারারাত শুটিং।

মোবারক সাহেবের মনে পড়ল–এই মেয়ে ছবিতে কাজ করে। এক্সট্রা। মূল নায়িকার সঙ্গে নাচে কিংবা গান গায়। নায়িকা যখন পুকুরে নেমে জলকেলি করে তখন সেও সঙ্গে থাকে। নায়িকার ভেজা শরীরের সঙ্গে তার ভেজা শরীরও দেখা যায়। এই মেয়েটির ভেজা শরীর নিশ্চয়ই নায়িকার শরীরের চেয়ে অনেক সুন্দর।

তোমার হাতে এখন যে ছবি তার নাম কী?

প্রেম দেওয়ানা।

ছবিতে তুমি যে চরিত্রটা করছি সেটা কি নায়িকার সখী?

উঁহুঁ—আমি খারাপ লোকদের আস্তানার একজন বাইজী।

গান গাও, না নাচ?

নাচি।

নাচ জান?

না। ড্যান্সমাস্টার আছে, শিখিয়ে দেয়। ঐগুলা নাচ না–হাত-পা নাড়া।

মোবারক সাহেব লক্ষ করলেন মেয়েটার কথা শুনতে তার ভালো লাগছে। দীর্ঘদিন একসঙ্গে এত কথা তিনি কারো সঙ্গে বলেন নি। আজ বলে ফেলেছেন। কথা বলতে ভালো লাগার কারণ কি? মেয়েটির গলার স্বর অস্বাভাবিক সুন্দর এটা একটা কারণ হতে পারে। দ্বিতীয় কারণটা স্থূল। খোলা ব্লাউজে মেয়েটি যে ভঙ্গিতে বসে আছে সে ভঙ্গিটা দেখতে ভালো লাগে। মোবারক সাহেবের মনে হলো পুরুষ প্রলুব্ধ করার এই ভঙ্গিটা মেয়েটি আগেও ব্যবহার করেছে। এটি তার বহু ব্যবহৃত কৌশল।

আপনি কি আমার নাচ দেখবেন?

নাচ।

আপনার ঘরে নাচের বাজনা আছে না? ইংরেজি বাজনা।

তুমি তো নাচ জান না। বাজনা থাকলে কী হবে? তাছাড়া নাচ দেখতে আমার ইচ্ছা! করছে না। তুমি কাপড় পর। কাপড় পরে চলে যাও।

সারারাত শুটিঙের কথা বাসায় বলে এসেছি।

বলবে শুটিং ক্যানসেল হয়ে গেছে। তোমাদের শুটিং ক্যানসেল হয় না?

হয়। আমরা বলি প্যাকআপ।

বাসায় গিয়ে তাই বলবে। বলবে শুটিং প্যাকআপ হয়েছে।

আচ্ছা আমি বলব। এখন আপনি অন্য ঘরে যান। আমি শাড়ি পরব।

অন্য ঘরে যেতে হবে না। আমার সামনেই পায়।

আপনার সামনে আমি পরব। কেন? আপনি কি আমার স্বামী?

মেয়েটি কঠিন গলায় কথাগুলো বললেও তার মুখ হাসি হাসি। মোবারক সাহেব ঘর ছেড়ে গেলেন না। ওয়ারড্রোব খুললেন। হ্যাঁঙারে পাঞ্জাবি ঝুলানো আছে। পাঞ্জাবির পকেটে মানিব্যাগ। মেয়েটিকে টাকা-পয়সা আগেই দেয়া হয়েছে–আরো কিছু দেয়া যাক। তিনি চারটা পাঁচ শ টাকার নোট বের করলেন। এক্সট্রা অভিনেত্রী হিসেবে এই মেয়ে কত রোজগার করে কে জানে।

তুমি যে অভিনয় কর কত পাও?

শিফট হিসাবে পাই। এক শিফটে দু'শ পঞ্চাশ টাকা।

কতক্ষণে এক শিফট?

আধ ঘণ্টায় এক শিফট।

নাও টাকাটা রাখ।

কেন?

খুশি হয়ে দিচ্ছি।

খুশি তো আপনি হন নাই। আপনি বেজার হয়েছেন।

না আমি খুশি, নাও।

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। মোবারক সাহেব পাশের ঘরে চলে এলেন। এই কামরা শোবার ঘরেরই এক্সটেনশন। ছোট্ট একটা বসার ঘর। চারটা গদি আঁটা নিচু চেয়ার। একটা লেখার টেবিল। টেবিলের পাশে আরেকটা তাকে পার্সোনাল কম্পিউটারমেকেনটস এল সি থ্রি। এই কম্পিউটার তিনি শুধুমাত্র দাবা খেলার জন্যে ব্যবহার করেন। কম্পিউটারে দাবার উপর খুব ভালো একটা প্রোগ্রাম আছে। ঘরের এক প্রান্তে বইয়ের সেলফ। একগাদা ইংরেজি ভূতের বইয়ে শেলফ ভর্তি। আসবাব বলতে এই।

মোবারক সাহেব লেখার টেবিলে বসলেন। টেবিলের উপর পেজ মার্ক লাগানো একটা বই– স্টিভেন ওয়াইনবার্গের–"The First 3 minutes". প্রথম চ্যাপ্টারে পেজ মার্ক দেয়া। প্রথম চ্যাপ্টারের নাম–The Giant and the Cow. দৈত্য ও গরু। চ্যাপ্টারের শিরোনাম হিসেবে সুন্দর। তিনি পেজ মার্ক দিয়েছেন, পড়তে শুরু করেন নি।

টেবিলের উপর ইন্টারকমে ছোট্ট লালবাতি জ্বলছে। ইন্টারকমের বোতাম টেপামাত্র একতলা থেকে ইদরিস বলবে, স্যার স্নালামিকুম।

এখন রাত বেশি না–এগারটা চল্লিশ। রাত তিনটায় বোতাম টিপলেও সঙ্গে সঙ্গে ইদরিসের সাড়া পাওয়া যাবে।

তিনি ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইদরিস বলল, স্যার স্নামালিকুম।

ইদরিস তুমি মেয়েটিকে পৌঁছে দিয়ে এস।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

আজ আমার সাইড টেবিলে অ্যাশট্রে ছিল না কেন ইদরিস?

ইদরিস জবাব দিল না। তিনি বুঝতে পারছেন ইদরিসের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছে।

কেউ কি টেলিফোন করেছিল?

আন্মা টেলিফোন করেছিলেন। আমি বলেছি আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ঠিক আছে।

আম্মা বলেছেন খুব জরুরি।

মোবারক সাহেব ইন্টারকম নামিয়ে রাখতেই দরজা ধরে মেয়েটি দাঁড়াল। মেয়েটিকে এখন কেমন অসহায় লাগছে। সে ক্ষীণ গলায় বলল, আমি যাই?

আচ্ছা।

আপনি আমার উপর রাগ করেছেন কেন আমি বুঝলাম না।

রাগ করি নি। আমি আরেকদিন তোমার নাচ দেখব।

বের হব কোন দিক দিয়ে?

দরজা খুলে হলঘরে চলে যাও। সেখান থেকে নিচে নামার সিঁড়ি আছে। নিচে নামলেই দেখবে ইদরিস তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

জ্বি আচ্ছা!

এত বড় বাড়ি কিন্তু কোনো শব্দ নেই। সুনসান নীরবতা। মোবারক সাহেব কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মেয়েটির নেমে যাওয়ার শব্দ শুনলেন। কলাপসিবল গেট খোলার শব্দ শুনলেন। গাড়ি স্ট্যার্ট দিয়ে বের হবার শব্দ শুনলেন। তখন তাঁর মনে হলো, মেয়েটিকে রেখে দিলে পারতেন। টুকটাক করে সুন্দর কথা বলছিল। মাঝে মাঝে অতি তুচ্ছ কথা শুনতেও ভালো লাগে। তিনি আবারো কলিংবেলে হাত রাখলেন, ইদরিস বলল, স্যার স্লামালিকুম। ইদরিস তাহলে মেয়েটির সঙ্গে যায় নি। ড্রাইভারের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। ইদরিস তাকে একা রেখে যাবে না। এটা ধরে নেয়া যায়।

ইসরিস!

জ্বি স্যার।

বাসার সঙ্গে টেলিফোন কানেকশন করে দাও, রেহানার সঙ্গে কথা বলব।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

তিনি টেলিফোন ধরার জন্যে লবিতে চলে এলেন। তার শোবার ঘরে কোনো টেলিফোন নেই।

কে রেহানা?

হ্যাঁ। ওমা একটু আগে ইদরিস বলল তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।

ভুল বলেছে। আমি জেগেই ছিলাম। বাতি নিভিয়ে শুয়ে ছিলাম, ইদরিস ভেবেছে ঘুমিয়ে পড়েছি। তুমি টেলিফোন করেছিলে কেন?

নাজু অ্যাকসিডেন্ট করেছে।

নাজুটা কে মোবারক সাহেব চিনতে পারলেন না। তাঁর শ্বশুরবাড়ির দিকের কেউ হবে। রেহানার দশ হাজার আত্মীয় আছে ঢাকা শহরে। তাদের সবাইকে চেনা সম্ভব নয়। চেনার কোনো প্রয়োজনও নেই।

ভয়াবহ অ্যাকসিডেন্ট। কী হয়েছে শোন...

মোবারক সাহেব দীর্ঘ গল্প শোনার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন। রেহানা অল্প কথায় কিছুই বলতে পারে না। 'সামারি এন্ড সাবসটেন্স' বলে তার কিছু নেই। সে ছোট্ট একটা গল্পকে রবারের মতো টেনে লম্বা করবে। মূল গল্প বলতে বলতে শাখা গল্পে চলে যাবে। সেখান থেকে যাবে প্রশাখায়...। এক সময় কোনটা আসল গল্প কোনটা প্রশাখা কিছুই বোঝা যাবে না।

নাজু নিউ এলিফ্যান্ট রোডে মোজা কিনতে গিয়েছিল। বাটা সিগন্যালের কাছে যে দোকানগুলো ছিল সেখান থেকে মোজা কিনে গাড়িতে উঠেছে। আজ আবার তার ড্রাইভার আসে নি। নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে। স্টার্ট নেবার সময় হঠাৎ অ্যাক্সিলেটরে পা দিয়ে ফেলেছে–সামনে এক লোক গ্যাস বেলুন বিক্রি করছিল, ওকে হিট করল...

মোবারক সাহেব ওয়াইনবার্গের বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। পড়তে শুরু করবেন। কিনা বুঝতে পারছেন না। অ্যাকসিডেন্টের গল্প দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলার কথা। ক্লান্তিহীন কথা একজন মানুষ কী করে বলতে পারে? মোবারক সাহেব টেলিফোনের কথা শোনায় আবার মন দিলেন–মাঝখানে তিনি বোধহয় কিছু মিস করেছেন, এখন হচ্ছে জন্মদিনের কেকের কথা। অ্যাকসিডেন্ট থেকে জন্মদিনের কেকের গল্প কীভাবে চলে এল কে জানে।

সোনারগাঁয়ে গিয়েছে কেকের জন্যে–ওরা বলল, দু'কেজির কম হলে কালই দিতে পারবে। এক শ মানুষের জন্যে দু'কেজি কেক–এ কি হবে? আধা চামচ করেও তো হবে না। তুমিই বল, জন্মদিনে এক শ মানুষ হবে না?

কার জন্মদিনে এক শ মানুষ হবে মোবারক সাহেব কিছুই জানেন না। তারপরেও বললেন, আমার ধারণা এক শ'র বেশি হবে।

এই তো তুমি বললে এক শ'র বেশি হবে। আমিও তাই বলছি। রুনীর ধারণা কেউ আসবে না...

মোবারক সাহেব কথার মাঝখানে কথা বলার মতো অভদ্রতা শেষ পর্যন্ত করলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, রেহানা শোন, আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আমি বরং শুয়ে পড়ি।

কখন মাথা ধরল?

সন্ধ্যা থেকেই।

সে কি! কেনো ডাক্তার ডাক নি।

সামান্য মাথাধরা। তার জন্য আবার ডাক্তার।

মাথাধরা কখনো সমান্য ভাববে না। অনেক মেজর ডিজিজের ফাস্ট ওয়ার্নিং হচ্ছে মাথাধরা। মাথাধরাকে সিরিয়াসলি নিতে হবে।

আচ্ছা এখন থেকে সিরিয়াসলি নেব। রেহানা রাখি?

রেহানা কিছু বলার আগেই তিনি টেলিফোন রেখে দিলেন। ঘুম আসছে কিনা। তিনি বুঝতে পারছেন না। ক্লান্তি লাগছে। ক্লান্তি এবং ঘুম পাওয়া এক জিনিস নয়। রাত জেগে খানিকক্ষণ ভূতের গল্প পড়া যেতে পারে। ঘুম আনার জন্যে ভূতের গল্প খুব কাজে আসে।

মোবারক সাহেব বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলেন পাঁচ শ টাকার নোট চারটি চাদরের উপর পড়ে আছে। মেয়েটি কি ভুল করে ফেলে গেছে, না ইচ্ছা করে ফেলে গেছে। অতি তুচ্ছ যে মানুষ, তারও খানিকটা অহঙ্কার থাকে। সেই অহঙ্কারের কারণে টাকা রেখে যাওয়া? তা বোধহয় না। মেয়েটি শুধু যে টাকা ফেলে গেছে তাই না–চুলের ফিতাও ফেলে গেছে। মেয়েরা চুলের ফিতা, খোঁপার কাঁটা এইসব ব্যাপারে খুব সাবধানী হয়।

এই মেয়েটি সম্ভবত ভুলো মনের। সে হয়তো ভেবেছে তার হ্যাঁন্ডব্যাগে টাকাগুলো রেখেছে–আসলে রাখে নি।

তিনি ভূতের গল্পে মন দেবার চেষ্টা করলেন। এলিন নামের একটা মেয়ে একা একা তার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে থাকে। সেভেন ইলিভেন শপে কাজ করে রাত দশটার দিকে ফেরে। শীতের রাত–ঘন কুয়াশা পড়েছে। ঘন কুয়াশার জন্যে এলিনের মনে হচ্ছে কে যেন তাকে ফলো করছে। সে যখন হাঁটে তখন পেছন থেকে জুতার শব্দ পাওয়া যায়। সে থেমে গেলেই জুতার শব্দ থেমে যায়। এলিন ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াল। বলল, কে?

আমি।

যে আমি বলল তার গলার স্বর খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। অথচ এলিন সেই পরিচিত শব্দ চিনতে পারছে না। এলিন ভয়ে ভয়ে বলল, কুয়াশার জন্যে আমি তোমাকে পরিষ্কার দেখতে পারছি না। তুমি কি দয়া করে এগিয়ে আসবে?

খটখট জুতার শব্দ করে যে এগিয়ে এল সে দেখতে অবিকল এলিনের মতো। পোশাকও পরেছে এলিনের মতো। গলায় লাল স্কার্ফ। হাতে হলুদ দস্তানা। গায়ে ছাইরঙা ব্লেজার।

মোটামুটি জমাট গল্প। খুব জমাট গল্পে মোবারক সাহেবের ঘুম ধরে যায়। মস্তিষ্কের একটি অংশ গল্পটা পড়তে চায়। অন্য অংশ বলে–শুয়ে পড়। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে।

গল্পটা পড়ার জন্যে উৎসাহ যত বাড়ে, ঘুমাও ততই বাড়ে। আজ তা হচ্ছে না। আজ তিনি সূক্ষ্ম এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করছেন। যন্ত্রণাও ঠিক না–অস্বস্তি। মশারি খাটিয়ে ঘুমুতে যাবার পর কেউ যদি সেখানে ফুটো আবিষ্কার করে তখন যেমন অস্বস্তি লাগে, সে রকম অস্বস্তি। চোখে ঘুম না। আসা পর্যন্ত মনে হয় এই বুঝি ফুটো দিয়ে মশা ঢুকে গেল। তার অস্বস্তির কারণটা কী? মেয়েটা এই বিছানাতেই শুয়ে ছিল–চাদর বদলানো হয় নি। তার গায়ের গন্ধ চাদরে লেগে আছে–এই জন্যেই কি অস্বস্তি?

মোবারক সাহেব বিছানার চাদর বদলালেন। বালিশের ওয়ার বদলালেন। লাভ হলো না। রাত সাড়ে চারটা পর্যন্ত তিনি অঘুমো বসে রইলেন। অথচ তাঁর ঘুম দরকার। কাল সন্ধ্যায় তিনি জাপান যাবেন। তাঁর একটা জাহাজ টেরিফ আইন ভঙ্গের দায়ে জাপানে আটকা পড়েছে। জাহাজের স্কিপারের লাইসেন্সেও নাকি কী সমস্যা আছে। তাঁকে যেতে হবে। দীর্ঘ ক্লান্তিকর ভ্রমণের আগে আরাম করে ঘুমানোর প্রয়োজন ছিল।

তিনি ভূতের বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। মেডিসিন বক্স থেকে ঘুমের ওষুধ বের করে খাবেন। একটা হিপনল তার সঙ্গে দু'টা প্যারাসিটামল। ওষুধ খাবার পর গরম এক কাপ কফি খেলে ভালো হতো। কফি খেলে সবার ঘুম চটে যায়। তার উল্টোটা হয়–ঘুম পায়।

মোবারক সাহেব ওষুধ খেয়ে পাশের ঘরে গেলেন। ইন্টারকম তোলামাত্র ইদরিস বলল, স্যার স্লামালিকুম। মোবারক সাহেবের ধারণা তিনি যে ক'দিন এ বাড়িতে থাকেন। সে ক'দিন ইদরিস ঘুমায় না। ইন্টারকমের পাশে জেগে বসে থাকে।

ইদরিস।

জ্বি স্যার।

কড়া করে এক কাপ কফি খাওয়াও তো।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

ঐ মেয়েকে কি দিয়ে এসেছে?

অনেক আগেই গাড়ি চলে এসেছে।

আচ্ছা ঠিক আছে।

তিনি আবার শোবার ঘরে চলে এলেন। বাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে গরম কফির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো–মেয়েটিকে তার সঙ্গে জাপানে নিয়ে

গেলে কেমন হয়। মেয়েটির জন্যে সেটা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার হবে না। সে হয়তো জীবনের প্রথম প্লেনে চড়বে, জীবনের প্রথম দেশের বাইরে যাবে। পদে পদে বিস্মিত হবে। তিনি খুব কাছ থেকে সেই বিস্ময় দেখবেন। বিস্মিত মানুষকে দেখতে ভালো লাগে। তার আশপাশে যারা থাকে তারা কেউ বিস্মিত হয় না। তিনি নিজেও বিস্মিত হওয়া ভুলে গেছেন।

একদিনে মেয়েটির পাসপোর্ট ও ভিসার ব্যবস্থা করা সমস্যা নয় বলেই তিনি মনে করেন। লোকমানকে খবর দিলেই সে ব্যবস্থা করবে। লোকমান পারে না এমন কাজ নেই। যে-কোনো কাজ দিয়ে তিনি যদি লোকমানকে বলেন–লোকমান, পারবে না? লোকমান তখন হতাশ তাকিয়ে থাকবে, মাথা চুলকাবে–ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলবে। তার ভাব দেখে মনে হবে সে গভীর সমুদ্রে পড়েছে কিন্তু বলবে সম্পূর্ণ উল্টো কথা। অস্পষ্ট গলায় প্রায় ফিসফিস করে বলবে–কেন পারব না?

এ ধরনের কথা বলার লোক দ্রুত কমে যাচ্ছে। কোনো কাজ দিলে বেশিরভাগ লোক বলে, স্যার চেষ্টা করে দেখব। সেই চেষ্টাটাও করে না।

দরজায় টোকা পড়ছে। গরম কফি নিয়ে ইদরিস চলে এসেছে। লোকমানের মতো এই আরেকজন। কুকুরের মতো অনুগত।

ইদরিস ভেতরে আস।

ইদরিস ঢুকুল। মোবারক সাহেবের দিকে চোখ তুলে তাকাল না। কখনো তাকায় না। টেবিলে কফির কাপ নামিয়ে রাখল। মোবারক সাহেব কাপ হাতে নিয়ে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বললেন, কফি ভালো হয়েছে। শোন ইদরিস, আমি সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমুব।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

লোকমানকে আমার একটু দরকার।

দশটার সময় আসতে বলব স্যার?

তিনি জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। ইদরিস বলল, এখন কি স্যার টেলিফোনে ধরে দেব? কথা বলবেন?

মোবারক সাহেব একটু চমকে গেলেন। এই মুহুর্তে তিনি ঠিক টেলিফোনে কথা বলার কথাই ভাবছিলেন। খুব যারা অনুগত তাদের মধ্যে টেলিপ্যাথিক সেন্স কাজ করে। ব্যাপারটা তিনি আগেও লক্ষ করেছেন। কুকুর তার প্রভুর মুড বুঝতে পারে–কুকুরের মতো যারা অনুগত তারাও পারে।

দাও, টেলিফোনে ধরে দাও।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

তিনি হালকা চুমুকে কফি খাচ্ছেন। কফি খেতে তাঁর ভালো লাগছে। ইদরিস এখনো টেলিফোনের লাইন দেয় নি। এখন দেবেও না–স্যারের কফি খাওয়া কখন শেষ হবে। তার

জন্য অপেক্ষা করবে। তিনি কফি শেষ করে কাপ টেবিলে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন বাজল। এও কি টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ?

স্যার আমি লোকমান। আপনার শরীর ভালো স্যার?

হ্যাঁ। তুমি কেমন আছ লোকমান?

আপনার দোয়া স্যার।

এত রাতে তোমাকে জাগালাম...

কোনো অসুবিধা নেই স্যার। আমি জেগেই ছিলাম।

জেগে ছিলে কেন?

আমার স্যার একটা অসুখ আছে। রাতে ঘুম হয় না।

জানতাম না তো।

আমাকে খোঁজ করছিলেন কেন স্যার?

শোন লোকমান, কাল দিনের ভেতর তুমি একটা পাসপোর্ট এবং জাপানের ভিসার ব্যবস্থা করতে পারবে?

পাসপোর্ট কোনো ব্যাপার না স্যার।

ভিসা পাওয়া যাবে না?

কাল তো স্যার রোববার–জাপান এম্বেসি বন্ধ। সব ফরেন এম্বেসিই বন্ধ।

ভিসা তাহলে সম্ভব না?

সম্ভব না। এমন কথা তো স্যার আমি বলি নি।

পারবে?

কোন পারব না?

মোবারক সাহেব তৃপ্তির হাসি হাসলেন। লোকমান বলল, স্যার যাবে কে?

তুমি সকালে চলে এস, তখন বলব।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

কত দিন ধরে তুমি রাতে ঘুমুতে পার না?

অনেকদিন স্যার।

অনেকদিন মানে কত দিন?

প্রায় চার বছর।

ও আচ্ছা। টেলিফোন তাহলে রাখি?

জ্বি আচ্ছা স্যার। আমি সকালে চলে আসব।

মোবারক সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রেখে বাথরুমে ঢুকে হাত-মুখ ধুলেন। অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করলেন। কফির মিষ্টি স্বাদ মুখে নিয়ে ঘুমুতে যাওয়া যায় না। একটু পান খেতে পারলে হতো। মৌরি দেয়া ছোট্ট এক খিলি পান।

চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। পরপর দু'বার হাই উঠল। শরীরে অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে। লোহিত রক্ত কণিকারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে–তারা এখন আর আগের মতো অক্সিজেন নিয়ে ছোটাছুটি করতে পারছে না।

তিনি জানালার ভিনিশিয়ান ব্লাইন্ডগুলো টেনে দিলেন। দিনের আলো যেন ঘরে না ঢোকে। পাঁচ ঘণ্টা তিনি একনাগাড়ে ঘুমুবেন। ফাইভ লং আওয়ার্স। থ্রি হানড্রেড মিনিটস।

পুরোপুরিভাবে বিছানায় যাবার আগে আবারো কী মনে করে ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন। ইদরিস সঙ্গে সঙ্গে বলল, স্লামালিকুম স্যার। তার বোধহয় লোকমানের মতো অনিদ্রা রোগ আছে।

ইদরিস!

জ্বি স্যার।

লোকমানের সকালে আসার দরকার নেই। ওকে নিষেধ করে দিও।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

ঘুমের ওষুধ, গরম কফি, সারাদিনের ক্লান্তি সব একসঙ্গে চেপে ধরেছে। তাঁর কেমন যেন একা লাগছে। একটু ভয় ভয়ও লাগছে। একজন কেউ পাশে থাকলে ভালো লাগত। গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবার সময় একজন কাউকে ছুঁয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। মোবারক সাহেব অস্বস্তি বোধ করছেন। কী একটা জিনিস যেন তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। টেপী নামের মেয়েটির শরীরে গন্ধ? হতে পারে। মানুষ চলে যায় কিন্তু সে তার গায়ের গন্ধ রেখে যায়। এই গন্ধ মোবারক সাহেবের পরিচিত–খুবই পরিচিত। এই জন্যেই কি তাঁর অস্বস্তি লাগছে?

কী বিশ্রী নাম মেয়েটার! নাম বদলে দিতে বলতে হবে–মেয়েটার জন্যে সুন্দর একটা নাম দরকার–ময়ূরাক্ষী নামটা কেমন? ময়ূরের মতো চোখ। ময়ূরের চোখ কি সুন্দর? তিনি জানেন না। ময়ূর দেখেছেন। কিন্তু ময়ূরের চোখের দিকে বিশেষ করে তাকিয়ে দেখেন নি। মানুষের চোখের তুলনা মানুষের চোখের সঙ্গেই হওয়া উচিত–পাখির চোখের সঙ্গে নয়। গন্ধটা নাকে লাগছে। মোবারক সাহেব পাশ ফিরলেন।

মুখে মেকআপ নিয়ে রেশমা বসে আছে

ন'টা থেকে মুখে মেকআপ নিয়ে রেশমা বসে আছে। ইন্টারকাটে তার একটা ক্লোজআপ যাবে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। এক্সট্রাদের ক্লোজআপ কখনো গুরুত্বপূর্ণ হয না। মূল শটগুলো ঠিকঠাক রাখার জন্যে এক্সট্রাদের দু'একটা ক্লোজআপ মাঝে মাঝে চলে আসে।

চোরাকারবারিদের আস্তানার সেট পড়েছে। নায়ক ফরহাদ চোরকারবারিদের হাতে ধরা পড়েছে। তাকে একটা খাম্বার সঙ্গে বাধা হয়েছে। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হবে। এই উপলক্ষে চোরাকারবারিদের মধ্যে আনন্দের বান ডেকে যাচ্ছে। মদ খাওয়া হচ্ছে। ফ্লোরে নাচের ব্যবস্থাও আছে। একদিকে ছবির হিরো আগুনে পুড়বে। অন্যদিকে নাচ চলবে। নায়ক ফরহাদের শট নেয়া হচ্ছে, চোরাকারবারিদের শট নেয়া হচ্ছে।

ফরহাদ সুপারহিট নায়ক। পরপর তিনটা ছবি তার হিট করেছে, বিজ্ঞাপনে তার সম্পর্কে লেখা হয়–গ্যালাক্সি হিট রোমান্টিক হিরো–ফরহাদ খান।

সবার নজর হিরোর দিকে। হিরোর হাত বাঁধা বলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর মিজান এখন তাকে সিগারেট খাওয়াচ্ছে। জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে ধরছে এবং ঠোঁট থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। ক্যামেরা রেডি করা আছে। হিরোর সিগারেট খাওয়া শেষ হলেই শট নেয়া হবে। হিরো 'ডায়ালগ' বলবে। দীর্ঘ ডায়ালগ–

তোরা আমার শরীরকে ধরেছিস। আমার শরীর বন্দি, কিন্তু আমার মন? আমার মন মুক্ত বিহঙ্গীর মতো স্বাধীন। মনকে বন্দি করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো শক্তির নেই।

হিরো সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলল, ডায়ালগ কড়া, ক্ল্যাপ পড়বে। তবে বিহঙ্গী ফিহজী রিকশাওয়ালারা বুঝবে না–পাখি করতে হবে।

ডাইরেক্টর আজমল তরফদার হাসিমুখে বললেন, অবশ্যই। হারামজাদা স্ক্রিপ্ট রাইটারের মাথার মধ্যে ঘুরে ডিকশেনারি। বিহঙ্গ। বিহঙ্গ আবার কী? মিজান ডায়ালগ ঠিক করে খাতায় লিখে ফেল। ফরহাদ ভাই আপনি রেডি?

হুঁ।

একটা মনিটার দিবেন নাকি?

মনিটার লাগবে না। ডাইরেক্ট টেক।

ওকে লাইটস।

আলো জ্বলল। হিরো বলল, শটটা কী রকম, ক্লোজআপ?

হুঁ।

ক্লোজআপ ভালো হবে না। লং শট থেকে জুম করে ক্লোজে আসুন।

আজমল তরফদার মনে মনে বললেন–হারামজাদা এখন ডাইরেকশনে চলে আসছিস। শটের তুই বুঝস কী?

মনে মনে যা বলা হলো মুখে তা বলা হলো না। মুখে বলা হলো–ঠিক ধরেছেন ফরহাদ ভাই। আপনার শট সেন্স মারাত্মক। লাস্ট ডায়ালগে মুখের উপর জুম করে বিগ ক্লোজআপে চলে যাব–শুধু চোখ। কেমন হবে রে মিজান?

ভালো হবে ওস্তাদ। শটের মতো শট।

জুম লেন্স লাগা। ক্যামেরার পজিশন চেঞ্জ কর।

ক্যামেরার পজিশন চেঞ্জ করে জুম লেন্স লাগাতে সময় লাগল। জুম লেন্স ছিল না। বারি স্টুডিও থেকে ভাড়া করে আনতে হলো। এই ফাঁকে অন্য শট নেয়া যেত। তার জন্যে আবার নতুন করে লাইটিং। সেটা কোনো সমস্যা না। সমস্যা হলো–গ্যালাক্সি হিরো প্রতিটি শটে নাক গলাবেন। দরকার কী? তার শট না নিয়ে অন্যের শট নিলে তিনি রাগও করতে পারেন। তাঁকে বলা হয়েছে একনাগাড়ে তাঁর কাজ শেষ করে অন্য কাজ ধরা হবে।

গ্যালাক্সি হিরো বললেন, জুম লেন্স আনতে দেরি হবে?

আজমল তরফদার হাই তুলতে তুলতে বললেন, না দেরি হবে না।

এইসব আপনার আগে ব্যবস্থা রাখেন না–শেষ সময়ে দৌড়াদৌড়ি!

অপমানসূচক কথা। তবে গ্যালাক্সি হিরোর এ ধরনের অপমান গায়ে মাখতে নেই। দুধ দেবে গরু, লাথি দেবে, গায়ের উপর পেচ্ছাব করে দেবে। জগতের এই হলো নিয়ম। তবে

দিন আসবে–তখন এই হিরোকেই মুখে রং মেখে সারাদিন বসে থাকতে হবে–কখন শটের জন্যে ডাক পড়ে। খুব সহজে সেই ডাক আসবে না।

হাতের বাঁধন খুলে দিন, বিশ্রাম করি।

ডাইরেক্টর সাহেবের ইঙ্গিতে ফ্লোর-ব্যয় হাতের বাঁধন খোলার জন্যে ছুটে গেল। হিরো বিরক্ত মুখে বললেন, কফি দিতে বলেন–নরম্যাল না, এক্সপ্রেসো। ইন্টার্ন প্লাজায় ভালো এক্সপ্রেসো পাওয়া যায়–একজন কাউকে পাঠিয়ে দিন, কাছেই তো।

ফ্লোর-ব্যয় আরেকজন চলে গেল এক্সপ্রেসো কফির সন্ধানে। হিরো চেয়ারে গা এলিয়ে বসতে বসতে বললেন, আজ আমাকে একটু সকাল সকাল ছাড়তে হবে–একটা জন্মদিন আছে, যেতেই হবে। আজমল ভাই, মাইন্ড করবেন না, পরে পুষিয়ে দেব।

আজমল তরফদার মনে মনে কুৎসিত একটা গালি দিলেন। মুখে কিছু বললেন না। তাঁর মেজাজ খুবই খারাপ হয়েছে। বিকেল চারটা পর্যন্ত শিফট। ব্যাটা এগারটার মধ্যে চলে গেলে কাজ কিছুই হবে না। শিফটের টাকা পুরোটাই যাবে।

আজমল ভাই মুখ বেজার করে বসে আছেন কেন?

না, বেজার হব কেন?

আজ একটু আর্লি যাব ঠিকই কিন্তু পুষিয়ে দেব। দেখবেন টপটপ কাজ নামিয়ে দেব— ‘বার্নিং সিন’ কি আজই হবে?

আজমল তরফদার আবার হাই তুললেন। মনে মনে বললেন–ক অক্ষর শূকরমাংস কিন্তু ইংরেজি বুলি বের হচ্ছে—'বার্নিং সিন'–বার্নিং সিন আমি তোর পাছা দিয়ে...

রেশমার সকাল থেকেই মাথাধরা। কাল রাতে ঐ বুড়ো যখন চলে যেতে বলল, তখনই রাগে তার মাথা ধরে গিয়েছিল। সেই মাথা ধরা এখনো যায় নি। যতই সময় যাচ্ছে ততই বাড়ছে। এখন মনে হয় জ্বর আসছে। তার শট হয়ে গেলে সে বাড়ি চলে যেতে পারত। শট হবে না বলে মনে হয়। না হলেও রাত এগারটা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে। গরম এক কাপ চা খেলে মাথাধরাটা কমত। প্রাডাকশনের কাছে চা চাইলে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এক্সট্রাদের ঘনঘন চা দেবার নিয়ম নেই। তবু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। চায়ের দায়িত্বে যে ফ্লোর-ব্যয় রেশমা তার কাছে গিয়ে মধুর গলায় বলল, সবুর ভাই, চা দেবেন? খুব মাথা ধরেছে।

চা নাই।

চা আছে। না বলছেন কেন? ছবির শুটিং চা ছাড়া চলে?

সবুর বিরক্ত চোখে তাকাল। ফ্লোর-বয়রা সাধারণত মেরুদণ্ড ছাড়াই জন্মগ্রহণ করে। এক্সট্রারা আশপাশে থাকলে মেরুদণ্ড ফিরে পায়। দিন না এক কাপ চা, অসম্ভব মাথা ধরেছে।

ক্যান্টিনে গিয়া চা খাও।

তাহলে ক্যান্টিনে চা খাওয়ার পয়সা দিন।

ওরে বাপরে! ম্যাডামের মতো কথা।

রেশমা ক্যান্টিনে যাওয়াই ঠিক করল। কাউকে বলে যাওয়া উচিত কিনা সে বুঝতে পারছে না। তার শট এখন নেয়া হবে না। এ ব্যাপারে সে এক শ ভাগ নিশ্চিত। তারপরেও প্রডাকশনের কারোর যদি চোখে পড়ে সে আশপাশে নেই অমনি মাথায় আগুন ধরে যাবে। প্রডাকশন সব সময় রেগে থাকে–রাগ ঝাড়ার মানুষ দরকার। এক্সট্রারা সেই মানুষ। রেশমা চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর মিজানের কাছে গেল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমার শটটা কখন হবে? মিজান ভুরু কুঁচকে তাকাল যেন এমন অসৌজন্যমূলক কথা সে তার জীবনে শোনে নি।

দেরি হবে?

জানি না।

ক্যান্টিন থেকে এক কাপ চা খেয়ে আসি মিজান ভাই? যাব আর আসব।

মিজান জবাব দিল না। সে মুখ ভর্তি করে পান খাচ্ছিল। ফ্লোরের ভেতরই পানের পিক ফেলল। এত কথা বলার তার সময় নেই।

যাব মিজান ভাই?

মিজান খেঁকিয়ে উঠল—সব সময় বিরক্ত করিস ক্যান? কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান না করলে ভালো লাগে না? কাজের সময় যন্ত্রণা!

রেশমা সরে এল। জুম লেন্স চলে এসেছে। ক্যামেরায় মাউন্ট করানো হচ্ছে। হিরোর হাত খাম্বার সঙ্গে বাধা হচ্ছে। মেকআপম্যান চুল ঠিকঠাক করে দিচ্ছে। চোরাকারবারিদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর ধরনের ধস্তাধস্তির পর সে ধরা পড়েছে। তাতে তার চুলের ভাঁজের কোনো ক্ষতি হয় নি। হিরোর শটে অনেক সময় লাগবে। এই ফাঁকে নিশ্চিন্ত মনে ক্যান্টিনে চা খেতে যাওয়া যায়।

ক্যান্টিনে গাদাগাদি ভিড়। কলিজির গরম সিঙ্গাড়া ভাজা হচ্ছে। দু'জন বয় সিঙ্গাড়া দিয়ে কুল পাচ্ছে না। রেশমা বসার জন্যে খালি চেয়ার খুঁজছে। দি রোজ মুভিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডাকশন ম্যানেজার দিলদার খাঁ হাত উঁচু করে আগ্রহের সঙ্গে ডাকল, এই যে ম্যাডাম, এদিকে আসেন।

দিলদার খাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডাকশান ম্যানেজার হলেও তার মূল কাজ মেয়ে মানুষের দালালি। ফিল্ম লাইনের মেয়েদের প্রতি বাইরের মানুষের আগ্রহ প্রচুর। ভালো অঙ্কের টাকা খরচেও এদের আপত্তি নেই। যোগাযোগটা সমস্যা। দিলদার খাঁ এই সমস্যার সমাধান করে। ভালোমতোই করে। দু'পক্ষ থেকেই তার কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

দিলদার বলল, ম্যাডাম, কী খাবেন বলেন?

কিছু না–চা।

শুধু চা খাবেন কেন ম্যাডাম? আমার উপর রাগ করেছেন?

ম্যাডাম ম্যাডাম বলবেন না তো দিলদার ভাই।

মেয়েছেলে মাত্রই আমার কাছে ম্যাডাম। তা সে চাকরানিই হোক কিংবা নায়িকাই হোক। ঐ দেখি ম্যাডামকে দু'টা সিঙ্গাড়া দে।

রেশমা সিঙ্গাড়া খাচ্ছে। খুব সাবধানে খেতে হচ্ছে যাতে ঠোঁটের লিপস্টিক উঠে না যায়। সিঙ্গাড়া খেতে গিয়ে সে টের পাচ্ছে তার খুব খিদে লেগেছে। প্রডাকশান থেকে সকালে ভালো নাশতা দেয়া হয়েছিল–কেক, চানাচুর, কলা, একটা মিষ্টি। তারপরেও এতটা খিদে থাকার কথা না।

দিলদার খ্যা রেশমার কাছে ঝুঁকে এসে বলল, 'প্রেম দেওয়ানা'র শুটিং হচ্ছে?

হুঁ।

রোল কী?

রোল কিছু না।

কোনো ডায়ালগ আছে?

দু'টা ডায়ালগ আছে।

ফিল্ম লাইনে কতদিন হলো?

দু'বছর।

তাহলে তো চিন্তার কথা।

চিন্তার কথা কেন?

দিলদার খাঁ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, তোমার চেহারা সুন্দর, বয়স সুন্দর, কথাবার্তা সুন্দর, তিন সুন্দর নিয়েও দু'বছরে যদি কিছু না হয় তাহলে আর হবে না। এক্সট্রা থেকে নায়িকার ছোটবোন, নায়িকার ছোটবোন থেকে নায়িকা। হয় না যে তা নয়, হয়। তবে দু'বছরের মধ্যে হয়। দু'বছরে না হলে–নো হোপ। দু'বছর পার করে দেবার পর ধরে নিতে হবে–এক্সট্রা হিসেবে রাইট ইন, এক্সট্রা হিসেবে লেফট আউট। হা-হা-হা!

হাসছেন কেন? এটা তো হাসির কোনো কথা না।

অবশ্যই হাসির কথা, শ্রীদেবীর মতো তোমার চেহারা। এই চেহারায় লাভ কী হলো? এক্সট্রার পার্ট আর মাঝেমধ্যে ক্ষেপ মারা।

আস্তে কথা বলেন দিলদার ভাই।

আস্তেই তো বলছি। শোন ম্যাডাম–বাইরের ক্ষেপ কমায়ে দাও, শরীরের সর্বনাশ হয়ে যায়। ফিল্ম লাইনে শরীরই আসল। মনে ভেঙে গেলে কোনো ক্ষতি নাই, শরীর ভাঙলে সর্বনাশ।

উঠি দিলদার ভাই।

উঠবে কী বস না, চা খাও আরেক কাপ।

না, কাজ আছে।

খাও খাও, আরেক কাপ চা খাও। ঐ ম্যাডামকে আরেক কাপ গরম চা।

সে দ্বিতীয় কাপ চা নিল। দিলদার খাঁ আরো খানিকটা ঝুকে এল। রেশমা অস্বস্তি বোধ করছে। দিলদার খাঁর মূল কাজ যে দালালি এটা কারো অজানা নয়। তার কোনো মেয়ের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলার একটাই অর্থ।

দিলদার খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, আমার বাসার ঠিকানা জান না?

রেশমা ঠিকানা জানে না, তবু বলল জানে।

টেলিফোন নিয়েছি। টেলিফোন নাম্বারটা লিখে রাখো। ইমার্জেন্সি টাকা-পয়সার দরকার হলে টেলিফোন করে দিও। আমার কাছে ভালো ভালো পার্টি আছে। সব ভদ্রলোক। একটাও দু'নম্বরী ভদ্রলোক না—আসল ভদ্রলোক। হাংকি পাংকি নাই।

এইসব কাজ এখন আমি করি না দিলদার ভাই।

দিলদার হাসল। পরক্ষণেই হাসি বন্ধ করে বলল, না করাটা তো ভালো। তারপরেও ধর হঠাৎ টাকা-পয়সার দরকার হয়ে গেল। টাকা তো আসমান থেকে পড়ে না। ব্যবস্থা করা লাগে। বর্তমানের ব্যবস্থা ছাড়াও ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে রাখতে হয়। আজ তোমার চেহারা আছে, স্বাস্থ্য আছে—দুদিন পরে কি থাকবে? থাকবে না। হঠাৎ একটা বড় অসুখ হয়ে গেল। তখন? পানি পড়া মাগনা পাওয়া যায়, ওষুধ মাগনা পাওয়া যায় না। খরিদ করা লাগে। কাগজ-কলম তোমার কাছে আছে?

না।

কাগজ-কলম আমার কাছেই আছে। টেলিফোন নাম্বার লিখে দিচ্ছি। যত্ন করে রেখে দিও। কখন দরকার হয়–কিছুই বলা যায় না।

উঠি দিলদার ভাই?

আচ্ছা। আমাদের প্রডাকশানের কাজ শুরু হচ্ছে। দেখি সেখানে তোমার জন্যে ভালো কোনো সাইড রোল পাওয়া যায়। কিনা।

ফ্লোরে ফিরে রেশমা হতভম্ব হয়ে গেল

ফ্লোরে ফিরে রেশমা হতভম্ব হয়ে গেল। শুটিং প্যাকআপ হয়ে গেছে। আজমল তরফদার শুকনো মুখে বসে আছেন। ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে বলে ফ্যান ঘুরছে না। একজন ফ্লোর-বয় তাকে প্রবল বেগে তালের পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। তারপরেও আজমল তরফদার ঘামছেন। ইউনিটের সব লোকজন কেমন যেন গম্ভীর। তারা আশপাশেই ঘোরাঘুরি করছে। শুটিং প্যাকআপ হওয়ার মূল কারণ হলো নায়ক ফরহাদের সঙ্গে ডাইরেক্টর সাহেবের খিটিমিটি হয়েছে। নায়ক এক পর্যায়ে বলেছেন, এই ছবির কাজ করব না। বলেই ফ্লোর থেকে বের হয়ে গাড়িতে উঠেছেন।

আজমল তরফদার ক্লান্ত গলায় বললেন, আজ হোক কাল হোক, এই নখড়ামি যে সে আমাদের সঙ্গে করবে। এটা জানতাম। আমার সঙ্গে তার কোনো খিটিমিটি হয় নি, সে যা বলেছে আমি শুনেছি। তার অন্যায় কথা শুনেও আমি বলেছি, ঠিক আছে–তারপরেও সে ফ্লোর থেকে চলে গেল। ঘটনাটা কী? ঘটনা তোমরা কেউ জান না, জানি আমি। ঘটনা বলি শোন–তার সাথে আমাদের ছবির কনট্রাক্ট হয় দু'বছর আগে। এক লাখ টাকায় কনট্রাক্ট। এক লাখ টাকা পেয়েই সে তখন হাতে আসমানের চাঁদ পেয়েছে। খুশিতে গুলগুলা। এর মধ্যে ঘটনা ঘটল–তার তিনটা ছবি হয়ে গেল সুপারহিট। এক লাখ টাকা থেকে বেড়ে তার রেমুনারেশন এক লাফে হয়ে গেল চার লাখ। আমাদের সঙ্গে আগের চুক্তি–এক লাখের চুক্তি। ব্যাটা গেছে ফেঁসে। এখন চাচ্ছে মোচড় দিয়ে আরো কিছু বের করে নিতে–এই হচ্ছে ব্যাপার। শুভঙ্করের অঙ্ক।

মিজান বলল, আমরা এখন স্যার করব কী? টাকা বাড়াব?

দেখি।

যদি বলেন সন্ধ্যার পর ফরহাদ ভাইয়ের বাসায় গিয়ে হাতে-পায়ে ধরে...।

করা যা ইচ্ছা।

আপনি সঙ্গে গেলে ভালো হয়–স্যার যাবেন?

আজমল তরফদার জবাব দিলেন না। ভুরু কঁচকে বসে রইলেন। শুটিং প্যাকআপ হবার পরেও কেউ যাচ্ছে না। বসে আছে। বিকেল চারটা পর্যন্ত শিফট। এখন বাজছে মাত্র বারটা। সারাদিনের কাজ মাটি হবে–তা তো হয় না। নায়ক ছাড়াও তো অনেক কাজ আছে। সেগুলো করা যায়।

ডাইরেক্টর সাহেব রাগের মাথায় প্যাকআপ বলার পরেও মিজান চোখের ইশারায় বলেছে–প্যাকআপ না, সাময়িক বিরতি। অবস্থা ঠাণ্ডা হলে কাজ আবার শুরু হবে। অবস্থা ঠাণ্ডা হলো না। মিজান যখন ডাইরেক্টর সাহেবের কানে কানে বলল, লাঞ্চ ব্রেকের পর কি স্যার ছোটখাটো দু'একটা কাজ করে ফেলব –তখন আজমল তফাদার প্রচণ্ড ধমক দিলেন, গাধার বাচ্চা, প্যাকআপ হয়ে গেছে তুই দেখছিস না? খালি বেশি কথা–সামনে থেকে যা। আমাকে কাজ শিখায়।

মিজান কুৎসিত ধমকে কিছু মনে করল না। কুৎসিত গালি, তুই তুকারি শুটিং ফ্লোরে চলবে না তো কোথায় চলবে? শুটিং ফ্লোর তো আর শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জ না। মিজান একটু দূরে সরে গিয়ে সিগারেট ধরাল। লাইটম্যানদের ইশারায় জানাল— শুটিং আসলেই প্যাকআপ। লাইট নামানো হচ্ছে। চারদিকে আনন্দময় ব্যস্ততা।

রেশমার বুক ধকধক করছে। তার মন বলছে আজ পেমেন্ট হবে না। গতকাল দু' শিফট কাজ হয়েছে। পেমেন্ট হয় নি–বলা হয়েছে আজকের কাজ শেষ হলে একসঙ্গে পেমেন্ট। আজ যে অবস্থা তাতে পেমেন্টের কোনো সম্ভাবনা সে দেখছে না। জয়দেবপুর ফিরে যাবার ভাড়া পর্যন্ত নেই। দুদিন হলো ঘরে চাল নেই। আশপাশের দোকান থেকে ধারে আনার উপায় নেই। সবাই টাকা পায়, ধার কেউ দেবে না। তারপরেও সে তিন কেজি চালের ব্যবস্থা করেছিল। আজ টাকা নিয়ে ফেরার পর এক সপ্তাহের চাল-ডালের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। রেশমা মিজানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মিজান বলল, কী চাস?

পেমেন্ট হবে না মিজান ভাই?

উঁ।

'উঁ' শব্দটা মানে কী রেশমা ধরতে পারছে না। 'হ্যাঁ' না 'না'?

খুব অসুবিধায় আছি মিজান ভাই।

আমরা কি খুব সুবিধায় আছি! বেআক্কেলের মতো কথাবার্তা বলিস কী জন্যে? ছবির বারটা বেজে গেছে আর তোর হলো পেমেন্ট? টাকা দরকার ভালো কথা–তার সময়-অসময় আছে না?

বড় অসুবিধার মধ্যে আছি মিজান ভাই।

অফিসে যা, অফিসে গিয়ে মুনশি সাহেবকে বল। এখানে কোনো পেমেন্ট হবে না। সব পেমেন্ট অফিসে।

ম্যানেজার সাহেবকে একটু বলে দেবেন?

আচ্ছা।

মনে থাকবে মিজান ভাই?

হুঁ।

রেশমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। গত মাসে 'বিনাকা স্টোর' থেকে খুব কায়দা করে বাজার করেছে। বিনাকা স্টোরের মালিক ইসমাইল সাহেবকে বলেছে, চাচা আজ আমার একটা সুসংবাদ আছে। আমাদের লাস্ট ছবিটা হিট করেছে তো–এই জন্যে সবাইকে বোনাস দেয়া হয়েছে।

ইসমাইল হাই তুলতে তুলতে বলল, ভালোই তো।

আপনার দোকান থেকে তো শুধু ধারেই বাজার করি আজ নগদা-নগদি খরিদ। ভুটানের মরিচের আচার আছে না! আজ ভুটানের একটা মরিচের আচারও কিনব। আছে?

ইসমাইল আবারো হাই তুলে বলল, হুঁ। সে হাই না তুলে কোনো কথা বলতে পারে না।

চাল, ডাল, আটা, ভুটানের মরিচের আচার, সয়াবিন তেল, চা, চিনি সব মিলিয়ে পাঁচ শ তিয়াত্তর টাকা। রেশমা বাজারের সব প্যাকেট একত্র করে দাম দেয়ার জন্যে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে–হতভম্ব চোখে ভ্যানিটি ব্যাগের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইসমাইল সন্দেহজনক গলায় বলল, কি টাকা চুরি গেছে?

না। আনতে ভুলে গেছি। চাচা আমার সঙ্গে কাউকে দিয়ে দিন। বাসা থেকে নিয়ে আসবে। যাবে আর আসবে। আমি রিকশা ভাড়া দিয়ে দেব।

ইসমাইল খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে বলল, কাল দিলেই হবে।

আমি স্টুডিওতে যাবার সময় দিয়ে যাব। আমি সকাল আটটার আগেই যাই—তখন দোকান খোলে না?

দশটার আগে দোকান খুলি না।

তাহলে ফেরার পথে দিয়ে যাব।

আচ্ছা।

রেশমা আর যায় নি। যাবে কীভাবে, হাত খালি। আল্লাহর অসীম মেহেরবানি ইসমাইল তার বাসা চেনে না। বাসা চিনলে লোক পাঠিয়ে দিত।

সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। রেশমা শুকনো মুখে বসে আছে বাণী কথাচিত্রের অফিসে। মিজান ম্যানেজার সাহেবকে রেশমার পেমেন্টের ব্যাপারে কিছু বলে নি। বাণী কথাচিত্রের ম্যানেজার মুনশি শুকনো মুখে বলেছে–শুটিঙের পেমেন্ট এখন বন্ধ। স্যারের লিখিত অর্ডার ছাড়া পেমেন্ট হবে না। মুনশি কঠিন লোক–কাঁদতে কাঁদতে তার পা জড়িয়ে ধরলেও কিছু হবে না। তারপরেও রেশমা বসে আছে যদি মিজান ভাই চলে আসেন। ইউনিটের লোকেরা ফিল্ম অফিসে দিনের মধ্যে একবার আসেই।

মুনশি বলল, খামাখ্যা বসে আছ কেন চলে যাও।

মিজান ভাই আমাকে থাকতে বলছেন।

তাহলে থাক।

রেশমা মনে মনে হাসল। অভাব তাকে আর কিছু শেখাক বা না শেখাক একটা জিনিস শিখিয়েছে। সুন্দর করে মিথ্যা বলা শিখিয়েছে। পৃথিবীতে সবচে’ সুন্দর করে মিথ্যা কারা বলে–অভাবী মানুষেরা। সবচে’ সুন্দর অভিনয় কারা করে? অভাবী মানুষেরাই করে। সারাক্ষণ তাদের অভিনয় করতে হয়। প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা নিয়ে রেশমা অপেক্ষা করছে অথচ সে তার মুখ হাসি হাসি করে রেখেছে। এই অভিনয় মোটেই সহজ অভিনয় না।

রাত আটটায় অফিস বন্ধ হয়ে যায়। আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। মুনশি বলল, কই মিজান সাহেব তো এলেন না।

রেশমা উদ্বিগ্ন গলায় বলল, আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি না। মিজান ভাই বললেন, সন্ধ্যার পর অফিসে চলে এস, জরুরি কথা আছে। ভুলে গেলেন। কিনা কে জানে। সম্ভবত ভুলে গেছেন।

সে উঠে দাঁড়াল। জয়দেবপুর ফিরে যাবার বাস ভাড়া তার কাছে নেই। সেটা সমস্যা না। তার মতো রূপবতী মেয়ে যদি কন্ডাক্টরকে নরম গলায় বলে–ভাড়া নাই–কন্ডাক্টর কিছু মনে করবে না। তবে এদের কাছে সত্য কথা বলতে হবে। এদের কাছে বানিয়ে কোনো গল্প বলা যাবে না। একজন অভাবী মানুষ অন্য একজন অভাবী মানুষের অভিনয় চট করে ধরে ফেলে। বাসের কন্ডাক্টরও অভাবী লোক।

আকাশে মেঘ করেছে। বৃষ্টি নামতে পারে। রেশমাকে মগবাজার বাসস্টেশন পর্যন্ত যেতে হবে। সে মনে মনে চাইছে বৃষ্টি নামুক। তবে এখন না বাসে ওঠার পর ঝুম বৃষ্টি নামুক। সে বৃষ্টির পানিতে ভিজে জবজবা হয়ে বাসায় যেতে চায়। গরমে ঘামে গা ঘিনঘিন করছে।

মানুষের অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছা বোধহয় সব সময় পূরণ হয়। বাস থেকে নেমেই রেশম বৃষ্টি পেয়ে গেল। ভালো বৃষ্টি। রিকশাওয়ালারা ঘণ্টা বাজিয়ে আসছে, আসুক, রিকশায় ওঠা যাবে না। প্রথমত টাকা নেই, দ্বিতীয়ত ইচ্ছা করছে না। বৃষ্টিতে ভিজতেও খুব যে আরাম লাগছে তা না। ফোটাগুলো ধারালো বলে মনে হচ্ছে। কেমন যেন গায়ে বিঁধে যাচ্ছে। কিছু

কিছু বৃষ্টি নরম করে গায়ে পড়ে, কিছু কিছু বৃষ্টি ধারালো বালির কণার মতো শরীরে বিঁধে যায়। এ রকম কেন হয় কে বলবে?

বাসার কাছাকাছি এসেই রেশমা তার শরীর থেকে ছবির নাম মুছে মিতু হয়ে গেল। এখন সে আর রেশমা না, এখন সে মিতু।

বাসার বারান্দায় মোড়ার উপর মবিন ভাই বাসা। তাঁর পাশে মিতুর বোন ঝুমুর। গালে হাত দিয়ে গল্প শুনছে। ঝুমুর মিতুকে দেখে নি। মবিন প্রথম দেখল এবং আঙুল উচিয়ে ঝুমুরকে দেখাল। ঝুমুর উঠে দাঁড়াল, খুশি খুশি গলায় চেঁচাল–আপা চলে এসেছে, আপা। ঝুমুরের, চিৎকার শুনে তার মা শাহেদা এসে দরজায় দাঁড়ালেন। তাঁর মুখও আনন্দে উজ্জ্বল। তিনি এগিয়ে এসে মেয়ের হাত ধরে নরম গলায় বললেন, ভিজে কী হয়েছিস, ভিজলি কেন? রিকশা নিয়ে চলে এলেই হত।

মিতু মবিনের দিকে তাকাল। মা'র সামনে এই মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে তার লজ্জা লাগে। আগে যখন আপনি করে বলত তখন লজ্জা লাগত না। এখন তুমি তুমি করে বলে বলেই লজ্জা লাগে। মিতু বলল, তুমি কখন এসেছ?

মবিন জবাব দিল না। মুখ টিপে হাসল। ঝুমুর বলল, মবিন ভাইয়া বিকেলে এসেছে। আমি বললাম, আপার আজ সেকেন্ড শিফট পর্যন্ত শুটিং, বারটার আগে আসবে না। মবিন ভাইয়া বলেছে অবশ্যই সে আটটার আগে চলে আসবে। উনার কথাই ঠিক হলো। আপা তুমি কাপড় বদলে আস। শীতে কাঁপছ।

মিতু কাপড় বদলাতে গেল। শাহেদা বাথরুমের পাশে তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি চাপা গলায় বললেন, মবিন আজ বাজার টাজার করে নিয়ে এসেছে।

কেন?

জানি না কেন? দু'কেজির মতো পোলাওয়ের চাল, খাসির মাংস, বাটার অয়েল। আমাকে বলল, মা আপনার হাতে পোলাও-কোরমা খেতে ইচ্ছা করছে।

রেঁধেছা পোলাও-কোরমা?

হুঁ। ঘরে আদা, গরম মসলা কিছুই নাই... তুই তো টাকা-পয়সাও দিয়ে যাস নি।

গরম মসলা ছাড়াই কোরমা রেঁধেছ?

না। মবিন বলল, আর কী কী লাগবে আমি তো জানি না–একটা কাগজে লিস্ট করে দিন নিয়ে আসি। বুদ্ধিমান ছেলে, আমাদের অবস্থা যে জানে না তা তো না।

তাড়াতাড়ি খাবার দিয়ে দাও মা, প্রচণ্ড খিদে লেগেছে।

তুই কি টাকা-পয়সা কিছু এনেছিস? মিতু জবাব দিল না। টাকা-পয়সা নিয়ে কথা বলতে কিংবা টাকা-পয়সা নিয়ে ভাবতে এই মুহূর্তে ভালো লাগছে না। শাহেদা চাপা গলায় বললেন, ও তোর জন্যে কী জানি এনেছে। হঠাৎ করে এইসব কী বুঝলাম না।

শাহেদা না বুঝলেও মিতু বুঝেছে। আজ ১৮ তারিখ, তার জন্মদিন। বাসায় কারোর মনে নেই–তার নিজেরও মনে নেই, কিন্তু মবিন ভাইয়ের ঠিকই মনে আছে। এই এক উপলক্ষ ধরে শুধু শুধু এতগুলো টাকা খরচ করার কোনো মানে হয় না। মিতু তোয়ালে দিয়ে ভিজে চুল জড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মবিন একা একা বসে আছে। তাকে কেমন রোগা রোগা লাগছে। মিতু হাসিমুখে বলল, তুমি নাকি আমার জন্যে কী উপহার এনেছ–মা বলল।

হুঁ।

কই উপহারটা দাও।

ঝুমুরের কাছে দিয়েছি।

জিনিসটা কী? বই?

উঁহুঁ। একটা শাড়ি। কমদামি জিনিস, সুতি শাড়ি। রঙটা খুব মনে ধরল।

কী রঙ?

জমিনটা হালকা বেগুনি, পাড় সবুজ।

কালো মেয়েদের জন্যে কখনো বেগুনি রং কিনতে নেই। বেগুনি রঙে কালো মেয়েদের আরো কালো দেখায়। বেগুনি রং আশপাশ থেকে রং শুষে নেয়।

এতসব জানি কীভাবে?

আমাদের মেকআপম্যান, তার কাছে শুনেছি।

আজ তোমাদের শুটিং ক্যানসেল হলো কেন?

নানান কারণ। অন্য কথা বল— তোমার সঙ্গে ছবির গল্প করতে ভালো লাগে না। চাকরি টাকরির কোনো খবর পেয়েছ?

না।

বাজার, উপহার এইসব দেখে ভাবলাম হয়তো কিছু পেয়ে গেছ।

এখনো পাই নি।

তাহলে করছি কী?

আগে যা করতাম, তাই করছি–জ্ঞানের ফেরিওয়ালা। বাড়ি বাড়ি জ্ঞান ফেরি করে বেড়াচ্ছি। প্রাইভেট টিউশ্যানি।

চাকরির ইন্টারভুদ্য দেয়া কি বন্ধ করে দিয়েছ?

না। এখনো দিচ্ছি। আমার ধৈর্য আমার দুর্ভাগ্যের মতোই সীমাহীন।

বইয়ের ভাষায় কথা বলবে না। আমার খুবই বিরক্তি লাগে। যা বলার সহজ সাধারণ ভাষায় বলবে।

আচ্ছা বলব।

মিতু মবিনের পাশে রাখা মোড়ায় বসতে বসতে বলল, তুমি জ্ঞানের ফেরিওয়ালা হয়ে যা রোজগার কর তাতে তোমার নিজেরই চলে না, তার উপর দেশে টাকা পাঠাতে হয়-এই অবস্থায় শুধু শুধু এতগুলো টাকা খরচ করা খুব অন্যায়।

মবিন হালকা গলায় বলল, ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে জানিনে...

তোমাকে না বললাম। বইয়ের ভাষায় কথা বলবে না।

দিনরাত বই পড়তে পড়তে নিজে খানিকটা বইয়ের মতো হয়ে গেছি। শুষ্কং কাষ্ঠং।

এই যে এত ইন্টারভ্যু দিচ্ছ-কোথাও কিছু হচ্ছে না?

প্রতিবারই হচ্ছে হচ্ছে একটা ভাব হয়, তারপর হয় না।

সেটা আবার কেমন?

দিন কুড়ি আগে চাকরির একটা ইন্টারভ্যু দিলাম। বোর্ডের চেয়ারম্যান বললেন, আপনার বাইরের পড়াশোনা তো বেশ ভালো। কোয়াইট ইম্প্রেসিভ। আপনার ইন্টারভ্যু নিয়ে ভালো লাগল। এই পর্যন্তই। চাকরি হয় নি।

একদিন নিশ্চয়ই হবে।

মবিন হাসল। সুন্দর করে হাসল। অন্ধকারে তার হাসিমুখ দেখা গেল না। মিতুর মনে হলো–দেখা না যাওয়াটাই ভালো। মানুষটার হাসিমুখ এত সুন্দর। দেখলেই বুকে অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

ঝুমুর এসে বলল, মবিন ভাই খেতে আসুন।

মবিন উঠে দাঁড়াল।

মেঝেতে পাটি বিছিয়ে খাবার আয়োজন। মবিনকে মাঝখানে রেখে দু'বোন দু'পাশে বসেছে। শাহেদা খাবার এগিয়ে দিচ্ছেন। মবিন তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, মা আপনি খাবেন না? সুন্দর করে মা ডাকল, কিন্তু শাহেদার সেই মা ডাক ভালো লাগল না। ছেলেটা ভালো। খুবই ভালো। তাঁর বড় ছেলে রফিকের প্রিয় বন্ধুদের একজন। তাকে দেখলেই রফিকের কথা মনে হয়। কিন্তু শাহেদার এই ছেলেকে পছন্দ না। অপছন্দের কারণও তিনি জানেন না।

মবিন বলল, মা আপনিও আমাদের সঙ্গে বসুন।

শাহেদা যন্ত্রের মতো বললেন, তোমরা খাও। রাতে আমি কিছু খাই না। অম্বল হয়।

ঝুমুর বলল, মবিন ভাই খেতে খেতে ঐ গল্পটা আবার বলুন না। সবাই শুনুক।

কোন গল্পটা?

জ্ঞানী ভূতের গল্পটা–আপা, তুমিও শোন–ভয়ঙ্কর হাসির। হাসতে হাসতে বিষম খাবে। ভূতরা তো সাধারণত খুব বোকা হয়–ঐ ভূতটা ছিল বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের প্রথম ছাব্বিশ পৃষ্ঠা তার মুখস্থ ছিল।

শাহেদা বিরক্ত গলায় বললেন, খাওয়ার সময় এত গল্প কী? চুপচাপ খেয়ে যা। মবিন খেতে পারছ? খেতে কেমন হয়েছে?

খুব ভালো হয়েছে মা। হোটেলের কুৎসিত খাবার খাই। পোলাও-কোরমা অমৃতের মতো লাগছে।

ঝুমুর বলল, মবিন ভাই অমৃত খেতে কি পোলাও-কোরমার মতো?

মবিন হাসিমুখে বলল, না। অমৃত খেতে মিষ্টি।

এমনভাবে বললেন যেন আপনি অমৃত খেয়ে দেখেছেন।

শাহেদা আবারো বিরক্ত গলায় বললেন, খাওয়ার সময় এত কথা কেন?

খাওয়া শেষ করে মবিন বারান্দায় বসে আছে। খুব জোরেশোরে বৃষ্টি নেমেছে। মবিনের পাশে ঝুমুর বসে আছে। সে চোখ বড় বড় করে গল্প শুনছে।

শাহেদা শুয়ে পড়েছেন। তাঁর শরীর ভালো লাগছে না। মিতু রান্নাঘরে চায়ের পানি বসিয়েছে। চায়ের দুধ নেই। রং চা বানাতে হবে। মবিন রং চা খেতে পারে না। ঝুমুর এসে পাশে বসল— চাপা গলায় বলল, আপা, কী রকম ঝুম বৃষ্টি নেমেছে দেখেছ?

হুঁ।

মবিন ভাই এ রকম ঝুম বৃষ্টির মধ্যে যাবে কীভাবে?

ভিজতে ভিজতে যাবে, আর কীভাবে যাবে।

আজ আমাদের বাসায় থেকে যাক না। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা তিনজন মিলে গল্প করব।

থাকবে কোথায়?

বসার ঘরে বিছানা করে দেব।

ও রাজি হবে না।

বললেই রাজি হবে। বলে দেখব আপা?

দেখতে পারিস।

ঝুমুর ছুটে চলে গেল। উৎসাহে তার চোখে ঝলমল করছে। মিতু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে কাপে চা ঢালছে। সে জানে মবিন রাজি হবে না। এইসব ব্যাপারে সে ভয়ঙ্কর সাবধান।

মিতু চা নিয়ে বারান্দায় গেল। ঝুমুর করুণ গলায় বলল, আপা, মবিন ভাই থাকতে রাজি হচ্ছে না। তুমি একটু বলে দেখ না।

মবিন চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বলল, তোমার আপা বললেও রাজি হব না।

বৃষ্টিতে ভিজে অসুখ বাঁধাবেন?

হুঁ, অনেক দিন অসুখবিসুখ হচ্ছে না। একটা অসুখ বাঁধাতে ইচ্ছা করছে।

চা শেষ করে বৃষ্টির মধ্যেই মবিন নেমে গেল। ঘরে কোনো ছাতা নেই। মিতুর মনটা খারাপ লাগছে। একটা ছাতা থাকলে বেচারাকে দেয়া যেত।

দু'বোন বারান্দায় বসে আছে। ঝুমুর বলল, মবিন ভাই নামল আর কী বৃষ্টিটাই শুরু হলো– আপা দেখলে?

হুঁ।

অসুখ অসুখ করছিল। এখন সে নির্ঘাত অসুখে পড়বে।

পড়ুক।

আপা উনি যে তোমার জন্যে শাড়িটা এনেছেন সেটা পরবে?

রাতদুপুরে নতুন শাড়ি পরব কেন?

পর না দেখি কেমন লাগে। প্লিজ।

শুধু শুধু বিরক্ত করিস না তো ঝুমুর। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আমি এখন শুয়ে পড়ব।

বেচারা শখ করে এনেছে পর না।

পরলে কী হবে? ও তো আর দেখবে না।

না দেখুক। তুমি তো জানবে–সে তোমার জন্যে কষ্টটষ্ট করে একটা শাড়ি এনেছে, তুমি সেটা পরেছ।

ওই শাড়ি আমাকে মানাবে না। বেগুনি রঙের শাড়ি, আমি কালো একটা মেয়ে।

প্লিজ আপা, প্লিজ।

ঝুমুর তোর খুব বিরক্ত করা স্বভাব হয়েছে। এক লক্ষবার প্লিজ বললেও আমি এখন শাড়ি পরব না।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তুমি পরবে।

আয় শুয়ে পড়ি। রাতদুপুর পর্যন্ত বারান্দায় বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

আরেকটু বসি আপা।

তুই বসে থাক। আমি শুয়ে পড়ি।

ও আপা, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। বিকেলে এক ভদ্রলোক এসে তোমাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছেন।

মিতু বিস্মিত হয়ে বলল, কী চিঠি?

আমি কী করে বলব। কী চিঠি? খামে বন্ধ। আমি খাম খুলি নি।

খাম খুলে মিতু চারটা চকচকে পাঁচ শ টাকার নোট পেল। কোনো চিঠি নেই, শুধুই টাকা। টাকাগুলো সে মোবারক সাহেবের বাড়িতে ফেলে এসেছিল।

ঝুমুর অবাক হয়ে বলল, এত টাকা কীসের আপা?

মিতু ফ্যাকাসে ভঙ্গিতে হাসল।

মোবারক সাহেবের হোটেলের ঘর

মোবারক সাহেবের হোটেলের ঘর আকাশের কাছাকাছি। একাশিতলার ৮৩৩ নম্বর রুম। জানালা খুললে রুমের ভেতর মেঘ ঢুকে পড়বে। তবে জানালা খোলার ব্যবস্থা নেই। রুমের সঙ্গে বারান্দার মতো আছে-বারান্দাও থাই এলুমিনিয়ামে ঢাকা। এখানে দাঁড়ালে টোকিও শহরের খানিকটা দেখা যায়। সবচে' ভালো দেখা যায় ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের রানওয়ে। প্রতি মিনিটে একটা করে প্লেন উঠছে–নামছে। প্লেন যে এমন রাজকীয় ভঙ্গিতে আকাশে ওড়ে মোবারক সাহেবের ধারণা ছিল না। বেশ খানিকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্লেনের উঠানামা দেখে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, উড়ার সময় প্লেনগুলো রাজকীয় ভঙ্গিতে উড়লেও নামার সময় ভয়ে ভয়ে নামে।

হোটেলে বারান্দার এই অংশটির নাম বিজনেস কর্নার। পারসোনাল কম্পিউটার, ফ্যাক্স মেশিন, লেখার চেয়ার-টেবিল সবই আছে। লেখার টেবিলের এক কোণায় কফি পার্কেলেটরে আগুনগরম কফি। মূল লেখার টেবিলের এক কোণে ছোট্ট টিভিতে সিএনএন-এর খবর দেখাচ্ছে।

বারান্দার এই অংশে সিগারেট খাওয়া যাবে। এ রকম একটা নোটিশ ঝুলছে। নো স্মোকিং সাইন বুললে সিগারেট খাবার ইচ্ছে হয় কিন্তু সিগারেট খাওয়া যায় এ জাতীয় নোটিশ দেখলে সিগারেট খেতে ইচ্ছা করে না।

আজ রোববার। ছুটির দিন। মোবারক সাহেব কাজকর্ম যা নিয়ে এসেছেন তার কিছুই আজ করার নেই। শহরে ঘুরে বোড়ানো বা শপিং করার প্রশ্ন আসে না। একটা নির্দিষ্ট

বয়স পর্যন্ত এইসব ভালো লাগে–তারপর ভালো লাগে না। তাছাড়া জাপানে তাঁর দেখার নতুন কিছু নেই। তিনি আরো খানিকক্ষণ প্লেনের উড়াউড়ি দেখলেন। আজ সারাদিন কী করবেন তার একটা তালিকা মনে মনে করলেন।

রেহানার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা। কথা না বললেও হয়–বললে ক্ষতি নেই। জীবনে যতবার দেশের বাইরে এসেছেন ততবারই স্ত্রীর সঙ্গে অন্তত একবার হলেও টেলিফোনে দীর্ঘ আলাপ করেছেন। তিনি অসংখ্যবার দেশের বাইরে গেছেন–রেহানা কখনো তার সঙ্গে আসে নি। রেহানার আকাশভীতি আছে। ছোটবেলায় তার হাত দেখে কে নাকি বলেছিল তার মৃত্যু হবে অ্যাকসিডেন্টে। রেহানার ধারণা সেই অ্যাকসিডেন্ট হবে আকাশে।

রেহানাকে টেলিফোনের পর চিঠি লেখা যেতে পারে। বাইরে এলেই তাঁর চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু চিঠি লিখবে কাকে? তাঁর চিঠি লেখার কেউ নেই।

বই পড়া যায়। ভূতের বইটা সঙ্গে এনেছেন–প্রথম গল্পটা মাঝামাঝি পর্যন্ত পড়া হয়েছে। গল্পের শেষটা কেমন দেখা যেতে পারে। সুন্দর করে শুরু করা গল্পের শেষটা সাধারণত খুব এলোমেলো থাকে।

মোবারক সাহেব কাপে কফি ঢাললেন। চা-কফি এইসব পানীয় নিজে ঢেলে খেতে ভালো লাগে না। অন্য কেউ বানিয়ে হাতে তুলে দিলে ভালো লাগে। টেপী মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে এলে ভালোই হতো। এই মুহুর্তে কফির কাপ হাতে তুলে দিতে পারত। ছুটির দিন ছিল। ছুটির দিনে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। যা দেখত তাতেই বিস্ময়ে অভিভূত হত। সেই বিস্ময় দেখতে ভালো লাগত। নিজের বিস্মিত হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলে অন্যের বিস্মিত চোখ দেখতে ভালো লাগে। মেয়েটিকে অনায়াসে নিয়ে আসা যেত। শেষ মুহুর্তে পরিকল্পনা বাদ

দিলেন–তবে মেয়েটি সম্পর্কে খোঁজখবর লোকমানকে পাঠাতে বলেছিলেন। লোকমান ফ্যাক্স গতকাল পাঠিয়েছে। তাঁর পড়ে দেখতে ইচ্ছা করে নি। এখনো করছে না। যখন করবে। তখন পড়ে দেখবেন।

কফি খেতে ভালো হয় নি। কিংবা হয়তো ভালোই হয়েছে। তাঁর নিজের ভালো লাগছে না। ভালো লাগা এবং মন্দ লাগার ব্যাপারটা তাঁর খুব তীব্র। যা ভালো লাগে না, হাজার চেষ্টা করেও তাকে আর ভালো লাগাতে পারেন না। যখন বয়স কম ছিল তখন ভালো লাগাতে চেষ্টা করতেন। এখন তাও করেন না।

রেহানাকে বিয়ের রাতেই তাঁর ভালো লাগে নি। পুতুল পুতুল টাইপের একটা মেয়ে। আয়নায় জবরজং হয়ে খাটের এক কোণায় জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল। ঘরে ঢুকেই তাঁর গোলাপ ফুলের গন্ধে মাথা ঘুরে গেল। দুনিয়ার গোলাপ দিয়ে বাসরঘর সাজিয়েছে। একটা গোলাপের ঘ্রাণ সহ্য করা যায়। কিন্তু এক লক্ষ গোলাপের ঘ্রাণ সহ্য করা যায় না। তাঁকে ঢুকতে দেখেই রেহানা মুখ তুলে তাকাল। সুন্দর মুখ। গোলগাল সুখী সুখী চেহারা, বড় বড় চোখ। তারপরেও মোবারক সাহেবের ভালো লাগল না। তিনি ভালো লাগার প্রাণপণ চেষ্টা করে বললেন, কেমন আছ রেহানা?

নববধু নড়েচড়ে বসল, জবাব দিল না।

কী গরম পড়েছে দেখেছি, গরমে ফুল পচে বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছে তাই না?

রেহানা বলল, জ্বি।

অথচ বাসরঘর মোটেই গরম ছিল না। শীতকালে বিয়ে হচ্ছে তারপরেও বাসরঘরের এয়ারকুলার চলছে। মাথার উপরে হালকাভাবে ফ্যান ঘুরছে। তিনি নববধূর পাশে বসে হাই তুললেন। বাসরঘরে নববধূর পাশে বসে খুব কম পুরুষই হাই তোলে। তিনি সেই কমসংখ্যক পুরুষদের দলে। রেহানা আশপাশে থাকলে এখনো তার হাই ওঠে। টেলিফোনে যখন তার সঙ্গে কথা বলেন তখনো হাই ওঠে।

মোবারক সাহেব হোটেলের বারান্দা থেকে শোবার ঘরে চলে এলেন। রেহানার সঙ্গে টেলিফোনে খানিকক্ষণ কথা বলবেন। দেশ থেকে আসা ফ্যাক্সগুলো দেখবেন। ভূতের বইটা পড়বেন। না, গোটা বই না, প্রথম গল্পের শেষটা। আজ দিনটা শুয়ে বসে কাটানো। কাল অনেক কাজ। কাজে সাহায্য করার জন্যে তিনি সঙ্গে কাউকে আনেন নি। যা করার তাকে একা করতে হবে। একজন কাউকে নিয়ে এলে হতো। কাজে সাহায্য না হোক কথা বলা যেত। মানুষ একা থাকতে পারে না। মানুষের সবচে' বড় শাস্তি মৃত্যুদণ্ড না–সলিটারি কনফাইনমেন্ট। নিঃসঙ্গ নির্বাসন।

হ্যালো রেহানা?

ওমা, তুমি!

কেমন আছ রেহানা??

আশ্চর্য, তুমি ফাট করে জাপান চলে গেলে। আগে তো কিছুই বল নি। আমি ইদরিসকে টেলিফোন করলাম–ইদরিস বলল, স্যার জাপানে। আমি বললাম–কোথায় আছে টেলিফোন

নাম্বার দাও। ও দিল না। বলল, সে জানে না। আমি মিশ্চিত সে জানে, তবু দিল না। তুমি কি ওকে বলেছ। আমাকে টেলিফোন নাম্বার না দিতে?

না।

তাহলে দিল না কেন?

বুঝতে পারছি না কেন দিল না।

তুমি অবশ্যই ওকে কঠিন ধমক দেবে। কী আশ্চর্য আমি টেলিফোন নাম্বার চাইলাম, ও দিল না। মিথ্যা কথা বলল...

রেহানা, তুমি কেমন আছ সেটা তো বললে না।

ভালো না। কাল সারারাত এক ফোটা ঘুম হয়নি। রাত এগারটার সময় ঘুমুতে গেছি তখনি মনে হয়েছে ঘুম হবে না। কান্তাকে টেলিফোন করলাম–কান্তা বলল, মাথায় পানি ঢেলে, এক কাপ গরম দুধ খেয়ে শুয়ে থাকতে। মাথায় পানি ঢালিলাম। কিন্তু গরম দুধ আর খুঁজে পাই না। চায়ের জন্যে কনডেন্সড মিস্ক ছাড়া ঘরে দুধ নেই। কল্পনা করতে পার? শেষে ডিপ ফ্রিজে এক প্যাকেট দুধ পাওয়া গেলা–জমে পাথরের মতো হয়ে গেছে। কল্পনা করতে পার? মাইক্রোওয়েভে দুধের পাথর গলাতে দিয়েছি–ওমা সেটাও নষ্ট! ঐ দুধ গরম করে খেতে খেতে রাত বেজেছে দু'টা।

গরম দুধ খাবার পরেও লাভ হয় নি? দেখেছি। শেষ রাতের দিকে চোখের পাতা একটু বন্ধ হয়েছে–তখন শুধু দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

তোমার সেই অ্যাকসিডেন্টের দুঃস্বপ্ন?

না। আরো ভয়ংকর। স্বপ্নে দেখলাম আমার যে কাজের মেয়েটা করিমের মা, সে বঁটি দিয়ে আমাকে কোপাচ্ছে।

বল কী?

আমি যতই বলি–এই করিমের মা, এই, ততই সে হাসে আর কোপ দেয়। যাই হোক সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিন মাসের অ্যাডভান্স বেতন দিয়ে ওকে বিদায় করেছি। যেতে চায় না–কান্নাকাটি করে–আমি পাত্তা দিই নি। এমনিতেই আমার রাতের ঘুম হয় না, তারপর যদি এরকম দুঃস্বপ্ন দেখার পরেও তাকে রেখে দেই, সেটা কি ঠিক হবে?

না, ছৌিক শ্নদ না।

তুমি জাপান থেকে আমার জন্যে একটা বই নিয়ে এস।

কী বই?

স্বপ্নের ইন্টারপ্রিটেশনের একটা বই। কোন স্বপ্ন দেখলে কী হয়–এই বই।

খাবনামা জাতীয় বই?

হুঁ।

এইসব বই আমাদের দেশের ফুটপাতে পাওয়া যাবার কথা। জাপানে কি পাওয়া যাবে?

তাই পাওয়া যাবে। স্বল্প নিয়ে সারা পৃথিবীতে রিসার্চ হচ্ছে। স্বপ্ন তো তুচ্ছ করার বিষয় না।

আচ্ছা আমি বই নিয়ে আসব। এখন টেলিফোনটা রাখি। জরুরি কোনো ফ্যাক্স এসেছে বলে মনে হচ্ছে। ফ্যাক্স মেশিনে শব্দ হচ্ছে।

রেহানাকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়ে মোবারক সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তিনি স্বস্তিবোধ করছেন–কারণ রেহানা তার কাছে টেলিফোন নাম্বার চায় নি। চাইতে ভুলে গেছে।

টেপীর সম্পর্কে লোকমান খোঁজ যা পাঠিয়েছে তাতে মোবারক সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। মেয়েটির নাম টেপী নয়–মিতু। তার ছবির জগতের একটা নাম আছে–রেশমা। তারা তিন বোন না, দু'বোন এক ভাই। ভাই জেলে আছে। সাত বছরের সাজা হয়েছে। বাবা চা বাগানে চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসা করতে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়েছেন। মিতু ইন্টারমিডিয়েটে পড়ার সময় তিনি মারা যান। মেয়েটির আর পড়াশোনা হয় নি।

লোকমানের পাঠানো রিপোর্টটা সম্পূর্ণ না। মেয়েট ছবির লাইনে কী করে এল রিপোর্টে এই তথ্য থাকা উচিত ছিল। মেয়েটির বাবা কীসের ব্যবসা করতেন? ভাইয়ের সাত বছরের সাজা হয়েছে–মামলাটা কীসের? খুনের মামলা? অস্ত্র মামলা?

মেয়েটি অভিনয় ভালোই জানে–শুরুতে তার সামান্য সন্দেহ হচ্ছিল মেয়েটি রসিকতা করছে–শেষে তিনি মেয়েটির কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। তিন বোন–হ্যাঁপী, টেপী, পেপী। এই হাস্যকর ব্যাপারটি যে-মেয়ে বিশ্বাস করিয়ে ফেলতে পারে তার অভিনয় ক্ষমতা তুচ্ছ করার মতো না।

মোবারক সাহেব দুপুরে কিছু খেলেন না। বরফের কুচি দেয়া এক গ্লাস টমেটোর রস খেয়ে শুয়ে পড়লেন। গল্পের বইটি পড়ার চেষ্টা করলেন। যতই এগুচ্ছেন গল্প ততই উদ্ভট হচ্ছে। ভূতের গল্প হিসেবে এইসব ছাইপাশ আজকাল লেখা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ কপি ছেপে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। কোনো মানে হয়?

ভরাপেটে আরাম করে ঘুমানো যায় না। হাঁসফাস লাগে। ক্ষিধে নিয়ে শুয়েছেন বলেই বোধহয় তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমুলেন। ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। অফিস থেকে টেলিফোন। তিনি যতদিন বাইরে থাকবেন ততদিনই প্রতি সন্ধ্যায় টেলিফোনে তাঁর খোঁজখবর নেয়া হবে। ঢাকা অফিসের খবর তাঁকে দেয়া হবে।

টেলিফোন করেছে লোকমান। মোবারক সাহেব কোমল গলায় বললেন, কেমন আছ লোকমান?

স্যার ভালো আছি। একটা ফ্যাক্স পাঠিয়েছিলাম স্যার, পেয়েছেন?

হ্যাঁ। ঢাকার খবর কী?

দেয়ার মতো কোনো খবর নেই স্যার। সব ঠিকঠাক আছে।

জুনের আঠার তারিখ মংলা পোর্টে আমাদের যে জাহাজ আসার কথা সেটা ঠিক আছে?

স্যার এখন পর্যন্ত ঠিক আছে। এডেন হয়ে আসবে, এডেনে কোনো সমস্যা না হলে তারিখ মতোই আসবে।

সমস্যা হবার কি কোনো সম্ভাবনা আছে?

জ্বি স্যার আছে।

আচ্ছা ঠিক আছে। ভালো কথা, একটা ছবি বানাতে কী পরিমাণ টাকা লাগে তুমি জান?

স্যার আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

ছবি বানাতে, টু মেক এ ফুল লেংথ ফিচার ফিল্ম, কী পরিমাণ টাকা লগ্নি করতে হয় তুমি কি জান?

স্যার আমি জানি না, তবে আপনি বললে খোঁজ নিতে পারি।

খোঁজ নিও তো।

আমি স্যার এখনি খোঁজ নেব। খোঁজ নিয়ে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে আপনাকে জানাব।

তাড়া কিছু নেই–তুমি খোঁজ নিয়ে রাখ, এক সময় আমাকে জানালেই হবে।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

লোকমান আমি তাহলে টেলিফোন রাখি?

টেলিফোন রেখে মোবারক সাহেব রাতের কর্মকাণ্ড মনে মনে ঠিক করে ফেলেন। ক্যাব নিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরবেন। বইয়ের দোকানে যেতে হবে–স্বপ্নতথ্য বিষয়ক বই কিনতে হবে। তারপর একটা মেক্সিকান রেস্টুরেন্ট খুঁজে বের করতে হবে। ডিনারের সঙ্গে মার্গরিটা খেতে ইচ্ছে করছে। মেক্সিকান রেস্টুরেন্ট ছাড়া এই পানীয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। জাপানি ক্যাবি ড্রাইভাররা ইংরেজি জানে না বললেই হয়। হোটেলের রিসিপশনিস্টদের সাহায্য নিতে হবে। বড় হোটেলের রিসিপশনিস্টদের সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগে না। এর যন্ত্রের মতো কথা বলে। আজ পর্যন্ত তিনি পাঁচতারা হোটেলে এমন কোনো রিসিপশনিস্ট পান নি যে মানুষের মতো কথা বলছে।

এই হোটেলের রিসিপশনিস্ট মেয়েটি এমন সাজ সেজেছে যেন সে এক্ষুণি বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাবে। পাতলা ঠোঁটে যে লিপষ্টিক দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে ঠোঁটে আগুন জ্বলছে। জাপানিরা ভালো ইংরেজি বলতে পারে না। কিন্তু মেয়েটি নিখুঁত আমেরিকান একসেন্টের ইংরেজিতে বলল, স্যার আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি? মোবারক সাহেব বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা নিয়ে মেয়েটিকে দেখছেন। যন্ত্র কথা বলছেমানুষ না।

কঠিন কিছু বলে মেয়েটির যন্ত্র ভাবকে নষ্ট করে দিলে সে হয়তো মানুষের মতো কথা বলত।

স্যার কিছু কি করতে পারি? মোবারক সাহেবের ইচ্ছা হলো বলেন–ইয়াং লেডি, আমি খুব একা বোধ করছি। তুমি কি তোমার ডিউটি শেষ হবার পর রাতে ঘণ্টাখানেকের জন্যে আসবে? তোমাকে আমি হ্যাঁন্ডসামলি পে করব।

এ জাতীয় কথা বললে সে একটা ধাক্কা খাবে। তার রোবট ভাব এতে কাটতে পারে। মোবারক সাহেব তেমন কিছু বললেন না, মেক্সিকান রেস্টুরেন্টের ঠিকানা চাইলেন। মেয়েটি দ্রুত ঠিকানা বের করে ফেলল। হাসিমুখে বলল, আমি কি ক্যাব ঠিক করে তাকে ইনসট্রাকশান দিয়ে দেব?

দিলে খুব ভালো হয়। ইউ আর সো কাইন্ড।

প্লিজ ডোন্ট মেনশান।

সব ধরাবাঁধা কথা। সব যন্ত্রের মতো কথা। যেন আগে থেকে প্রোগ্রাম করা।

রেহানাও তো এরকম। সে কোনো পাঁচতারা হোটেলের রিসিপশনিস্ট নয়। কিন্তু সে যখন কথা বলে তখন সেও তো তার ধরাবাধা গৎ-এ চলে আসে। এর বাইরে যেতে পারে না। এর বাইরে কথা বলতে পারে না। আসলে সব মানুষই কি এ রকম নয়? তিনি নিজেও কি একজন রোবট না?

মানুষ রোবট কীভাবে হয়? চট করে হয় না–খুব ধীরে ধীরে হয়। কাজেই এই প্রক্রিয়া বোঝা যায় না–এক ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে দেখে সে রোবট হয়ে গেছে। তখন সে আতংকে অস্থির হয়ে যায়। তিনি নিজে কি এখন আতংকে অস্থির হয়েছেন? হ্যাঁ হয়েছেন। সারাক্ষণ তাঁর একা এক লাগে এবং মানুষের সঙ্গও অসহ্য বোধ হয়। এই অসহ্য বোধ হওয়া ব্যাধি বাড়ছে। ক্রমেই বাড়ছে। এর মধ্যে দু'বার তাঁর মনে হয়েছে বেঁচে থাকার তেমন কোনো অর্থ নেই। সাধারণভাবে মনে হয় নি, তীব্রভাবেই মনে হয়েছে।

প্রথমবার মনে হলো তিন বছর আগে। রাতে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমুতে গেছেন। রেহানা বলল, আজকের ভেজিটেবল কোপ্তা তোমার কেমন লেগেছে? তিনি বললেন, ভালো।

একটু টক টক লাগছিল না?

হুঁ।

তেঁতুল বেশি হয়ে গিয়েছিল। মাদ্রাজি রান্না তো–সব কিছুতেই তেঁতুল দেয়।

হুঁ।

আমি বাবুর্চিকে বলেছি–তেতুল ছাড়া একবার করতে।

ভালো করেছি।

কাল করতে বলব?

বল।

তিনি কোলবালিশ জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। বাতি নিভিয়ে রেহানা ঘুমুতে এল এবং সে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। তাঁর ঘুম আসছিল না। তিনি এপাশ-ওপাশ করলেন না। নড়াচড়া করলে রেহানার ঘুম ভেঙে যাবে। চুপচাপ শুয়ে রইলেন। বাথরুমের ট্যাপ বোধহয় ভালোমতো বন্ধ করা হয় নি। কিছুক্ষণ পর পর 'টপ' করে পানির ফোঁটা পড়ার শব্দ আসতে লাগল। এক মিনিট নীরবতা–তারপর 'টপ' করে একটা শব্দ। আবার নীরবতা আবার শব্দ। তিনি সাবধানে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। বাথরুমের ট্যাপ ভালো করে বন্ধ করলেন। তখন ঘড়ির শব্দ শোনা যেতে লাগল। টক টক করে সেকেন্ডের কাঁটা নড়ছে। তিনি আবার উঠলেন। দেয়াল থেকে চেয়ারে দাঁড়িয়ে ঘড়ি নামানোর কোনো অর্থ হয় না। তিনি খানিকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সামনের রাস্তা ফাঁকা। কোনো লোক চলাচল নেই। শীতের রাতে এই সময় লোক চলাচল থাকেও না। সে রাতে শীত খুব তীব্র ছিল। কিন্তু তার শীত লাগিছিল না। তাঁর গায়ে ফ্লানেলের স্লিপিং স্যুট। বারান্দায় খোলা বাতাস দিচ্ছে। শীতে তাঁর জমে যাওয়ার কথা। তিনি রেলিং ধরে দাঁড়ালেন। তার একটু গরম লাগতে লাগল। সেই সঙ্গে ক্ষীণ ইচ্ছা হতে লাগল। লাফ দিয়ে নিচে পড়ে যেতে। তাঁর মনে হলো পড়াটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে। তিনতলা থেকে নিচে পড়ার সময় মাথাটা যদি আগে পড়ে তাহলে মাথা থ্যাতলানোর টাস করে একটা শব্দ হবে। সেই শব্দটাও ইন্টারেস্টিং হবার কথা। এই জাতীয় চিন্তা সব মানুষের ভেতর কখনো না কখনো আসে, কিন্তু চিন্তাটা স্থায়ী হয় না। মুহূর্তের মধ্যে আসে আবার মুহুর্তের মধ্যে চলে যায়। তাঁর গেল না। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে লাফিয়ে নিচে পড়বেন। পড়ার জন্যে ভালো জায়গা রেব করতে হবে। নরম কোনো জায়গায় পড়লে হবে না। শানবাধানো জায়গায় পড়তে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি লাফিয়ে নিচে পড়ে যাবেন এই চিন্তাটা তাঁর এত ভালো লাগতে লাগিল যে

আনন্দে গায়ে কাটা দিল। তার মনে হলো-অনেক অনেক দিন তিনি এই আনন্দ পাননি। তিনি রেলিঙের ওপর উঠতে যাচ্ছেন তখন শোবার ঘরের থেকে রেহানা বলল, এই তুমি একা একা এখানে কী করছ?

তিনি স্ত্রীর দিকে তাকালেন। এত বিরক্তি এবং এত রাগ নিয়ে তিনি তার নীর এর আগে তাকান নি।

পাতলা একটা জামা গায়ে দিয়ে আছ, তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না? আমি তো শীতে মরে যাচ্ছি। ঘুম আসছে না?

না।

ঘুমের ওষুধ খাবে? না খাওয়াই ভালো–একবার খেলে অভ্যাস হয়ে যায়। আমাকে দু'তিনটা সিডাকসিন না খেলে তন্দ্রা পর্যন্ত আসে না। এস, ভেতরে এল। ইস্‌রে কী ঠাণ্ডা!

তিনি ঘরে ঢুকলেন। বিছানায় ঘুমুতে গেলেন এবং বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি বোকা নন, তিনি বুদ্ধিমান মানুষ, যা ঘটেছে তা যে আবারো ঘটবে তা তিনি জানেন। তিনি যদি বেঁচে থাকতে চান সেই পথ তাঁকে খুঁজতে হবে। এখানে সাহায্য করার আসলে কেউ নেই।

বিলেতে তিনি এক নামি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছিলেন। এক এক সিটিঙে। এই ভদ্রলোক পঁচাত্তর পাউন্ড করে নেন। রঙচঙে পোশাক পরা এক বুড়ো, যে ফুর্তিবাজের

ভূমিকায় অভিনয় করার চেষ্টা করছে। অভিনয় ভালো হচ্ছে না। মোবারক সাহেব চট করে সেই অভিনয় ধরে ফেললেন এবং বুড়োর জন্যে একটু মায়াও লাগল।

বুড়ো বলল, তোমার সমস্যাটা কী?

মোবারক সাহেব বললেন, আমার কোনো সমস্যা নেই।

আমার কাছে এসেছে কেন?

গল্প করতে এসেছি।

বোস। বোস। আরাম করে বোস এবং গল্প কর। গল্প তুমি করবে, না। আমি করব?

মোবারক সাহেব বললেন, দু'জনে মিলেই করব। প্রথমে তুমি শুরু করা–দেখি তোমার গল্পটা ইন্টারেস্টিং কিনা। তুমি নিশ্চিত তোমার কোনো সমস্যা নেই?

আমি নিশ্চিত।

তাহলে তো তুমি মানুষ না, তুমি ফার্নিচার গোত্রীয়–টেবিল বা চেয়ার। মানুষ হলে সমস্যা থাকতেই হবে।

তোমাদের বিদ্যা তাই বলে?

হ্যাঁ, তাই বলে। প্রচুর সমস্যা থাকবে–তোমরা আমাদের কাছে আসবে। আমরা খেয়ে পরে বঁচিব, তোমরাও পাউন্ড খরচের একটা জায়গা পাবে–হা-হা-হা।

মোবারক সাহেব লক্ষ করলেন, বুড়ো নকল হাসি হাসছে। এদের কাছে আসা অর্থহীন। তারপরেও কিছু কথাবার্তা হলো। তিনি এক সময় জানতে চাইলেন–মানুষ মরতে চায় কেন?

বুড়ো কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, অসংখ্য কারণে মানুষ মরতে চায়, তুমি কী জন্যে চাচ্ছ সেটা তুমি জান।

মোবারক সাহেব মনে মনে বুড়োর বুদ্ধির প্রশংসা করলেন। একটা সিটিঙে যে পঁচাত্তর পাউন্ড নেয়। তার কিছু বুদ্ধি তো থাকতেই হবে। বুড়োর সঙ্গে আলাপ করে মোবারক সাহেবের কোনো লাভ হয় নি। তার সমস্যা তিনি জানেন। তিনি বিস্মিত হবার ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলেছেন। তাঁকে বেঁচে থাকতে হলে বিস্মিত হবার ক্ষমতা ফিরে পেতে হবে। কিংবা এমন কাউকে পাশে লাগবে যার বিস্মিত হবার ক্ষমতা প্রবল।

বইয়ের দোকান থেকে তিনি স্বপ্নের উপর দু'টা বই কিনলেন। সেলস গার্ল হাসিমুখে বলল, তুমি বুঝি খুব স্বপ্ন দেখ?

মেয়েটার কথা তাঁর ভালো লাগল। এই মেয়েটি রোবট হয়ে যায় নি। তার বিস্মিত হবার ক্ষমতা আছে। দু'টা স্বপ্নের বই কিনতে দেখে সে বিস্মিত হয়েছে।

তুমি কি আর কোনো বই নেবে?

সুইসাইডের উপর কোনো বই আছে?

হ্যাঁ আছে। Anatomy of Suicide.

পাঁচ শ পৃষ্ঠার বিরাট একটা বই। তিনি ডলার দিচ্ছেন। মেয়েটা কৌতুহলী হয়ে তাকে দেখছে।

রেশমা ক্যান্টিনে চা খেতে ঢুকেছে

রেশমা ক্যান্টিনে চা খেতে ঢুকেছে। এফডিসির ক্যান্টিনে এই সময় জায়গা পাওয়া মুশকিল- আজ ফাঁকা। শুধু যে ক্যান্টিন ফাঁকা তাই না–পুরো এফডিসিই ফাঁকা। সবার শুটিং প্যাকআপ হয়ে গেছে–ফাইটার গ্রুপের একটা ছেলে মারা গেছে। শুটিং এই কারণে বন্ধ। ক্যান্টিনের ম্যানেজার বিরস মুখে বসে আছে। এক কোণায় দিলদার খাঁ বৃদ্ধা একজন এক্সট্রার সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে–নানি নানি করে ডাকছে। নানির সঙ্গে ঝলমলে পোশাক পরা এক কিশোরী। চোখ বড় বড় করে সে গল্প শুনছে। দিলদারের দৃষ্টি কিশোরীর দিকে। রেশমাকে দেখে দিলদার খাঁ আনন্দিত গলায় বলল, এই যে ম্যাডামকে পাওয়া গেছে। আস আস। কিশোরী মেয়েটি প্রবল বিস্ময়ে তাকে দেখছে। সত্যি সত্যি রেশমাকে বোধহয় নায়িকা ভেবেছে। রেশমা এগিয়ে গেল। দিলদার খাঁ দরাজ গলায় বলল, ম্যাডামকে চা দাও। সিঙ্গাড়া দাও। তারপর ম্যাডাম, খবর কী?

কোনো খবর নাই।

শুটিং নাকি আবার শুরু হয়েছে। খবর নাই বলছি কেন? এইটাই তো বড় খবর।

দিলদার ব্যস্ত হয়ে মানিব্যাগ বের করল। রঙচঙে একটা কার্ড বের করে বলল, নাও যত্ন করে রাখ।

এটা কী?

ভিজিটিং কার্ড। ছাপিয়ে ফেললাম। অ্যাড্রেস টেলিফোন নাম্বার সব লেখা আছে।

ভালো করেছেন। ভালো মন্দ জানি না, যে ব্যবসায় যে চাল। এখনকার চাল হচ্ছে–দু'টা কথা বলার পরই হাতে ভিজিটিং কার্ড গুঁজে দেয়া। কিছুদিন পর দেখব লোকজনের দেখা হবে কিন্তু কথাবার্তা হবে না। দু'জন দু'জনের হাতে ভিজিটিং কার্ড দিয়ে যে যার পথে চলে যাবে—হা-হা-হা।

বৃদ্ধার চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। সে বলল, দিলদার ভাই উঠি?

দিলদার বলল, আরো না এখনই কী উঠবে? কথাই তো হয় নি। এই মেয়ে কে? তোমার নাতনি?

হুঁ।

চেহারা ছবি তো ভালো–অভিনয় করবে? নাম কী?

জমিলা।

আগ্রহ থাকলে কোনো এক জায়গায় ঢুকিয়ে দেব–অসুবিধা নাই। মেয়ের অবশ্য ঠোঁট মোটা, সেটা কোনো ব্যাপার না। কপালে থাকলে নায়িকা হওয়া কিছু না।

রেশমা লক্ষ করল। জমিলার চোখ চকচক করছে। রেশমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। দিলদার রেশমার দিকে ঝুকে এসে বলল, তোমাদের ছবির সমস্যা মিটমাট কীভাবে হলো?

জানি না।

সবাই জানে। তুমি কিছু জান না–এটা কেমন কথা। সত্যি জান না?

না।

তাহলে শোন আমার কাছে। সে এক ইতিহাস...

ইতিহাস শোনা হলো না। রেশমাদের একজন প্রডাকশন বয় ক্যান্টিনে ঢুকেছে। সে রেশমাকে দেখে রাগী গলায় বলল, ওস্তাদ তোমারে খুঁজে।

রেশম চা রেখেই উঠতে যাচ্ছিল। দিলদার বলল, চা শেষ করে তারপর যাও। যত বড় ওস্তাদই হোক–খাওয়া ফেলে ছুটে যেতে হবে না। তাছাড়া শুটিং তো আজ হচ্ছে না। পুরো এফডিসি প্যাকআপ।

চা আগুনগরম। দ্রুত খাওয়া যাচ্ছে না। দিলদার বলল, ম্যাডাম আস্তে আস্তে খান। জিভ পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। হা করলে দেখা যাবে কুচকুচে কালো জিভ।

জমিলা মেয়েটি এই রসিকতায় খুব হাসছে। মেয়েটা সুন্দর। সত্যিকার রূপবতী মেয়েদের লক্ষণ হলো হাসলেও এদের সুন্দর দেখা যায়। বেশিরভাগ রূপবতী মেয়ে হাসলে কুৎসিত হয়ে যায়। এই মেয়েটা হচ্ছে না। সে যতই হাসছে ততই সুন্দর হচ্ছে।

রেশম চায়ের টাকা দিতে গেল। দিলদার হুংকার দিয়ে উঠল, খবরদার ম্যাডাম। তুমি দিলদারের গেস্ট। ভিজিটিং কার্ডটা যত্ন করে রেখে দিও–কখন দরকার হয় কে জানে।

রাত ন'টার পর টেলিফোন করলে পাবে। অনেক সময় টেলিফোন লাইন নষ্ট থাকে–তখন সরাসরি চলে আসবে, অ্যাড্রেস লেখা আছে।

ন'নম্বর শুটিং ফ্লোরে লোকজন নেই। এক ঘণ্টা আগে প্যাকআপ হয়েছে। এতক্ষণ লোক থাকার কথা না। লাইট সরানো হয় নি। সেকেন্ড শিফটে কাজ হবে–কাজেই যেটা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। আজমল তরফদার এখন বাড়ি যাবেন না। শট ডিভিশনের কিছু কাজ বাকি আছে। কাজ শেষ করবেন। ট্রলি শট যে কটা ছিল সব বদলাতে হচ্ছে। ফ্লোর উঁচুনিচু হয়েছে। ট্রলি স্মুথলি মুভ করছে না। ক্যামেরা কাঁপছে।

আজমল তরফদার চোখ বন্ধ করে চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর মাথা ধরেছে। একজন ফ্লোর-ব্যয় তাঁর মাথা টিপে দিচ্ছে। তাঁর ঠিক দু'হাত পেছনে ফ্লোর ফ্যান বসানো হয়েছে। ফ্যান থেকে বাতাস যত না হচ্ছে শব্দ হচ্ছে তারচেয়েও বেশি।

রেশমা আজমল তরফদারের সামনে দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে বলল, আজমল ভাই, আমাকে খবর দিয়েছেন? আজমল তরফদার চোখ মেললেন, চোখ টকটকে লাল। এটা কোনো অসুখ না বা রাত্রি জাগরণের ফলও না। সব সময় তাঁর চোখ এ রকম। প্রথমবার দেখলে মনে হয়–কিছুক্ষণ আগেই আলতা দিয়ে চোখ ধোয়া হয়েছে।

আজমল তরফদার চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। যে ফ্লোর-বয় মাথা বিলি দিয়ে। দিচ্ছিল তাকে বললেন, ঠাণ্ডা এক গ্লাস লেবুর শরবত আমার জন্যে আন। চিনির শরবত না, লবণের শরবত।

রেশমা দাঁড়িয়ে আছে। এই মানুষটাকে তার ভয় ভয় লাগে। তবে মানুষটা ভালো। মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টির কোনো বদনাম এই মানুষটার নেই।

রেশমা তোমার নাম?

জ্বি।

দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোস।

বসার জন্যে চেয়ার বা টুল কিছুই নেই। বসতে হলে মেঝেতে বসতে হয়। রেশম মেঝেতে বসে পড়বে কিনা বুঝতে পারছে না। আজমল তরফদার হুংকার দিলেন–এই কেউ নেই, এখানে চেয়ার দিয়ে যা।

ফ্লোর-ব্যয় চেয়ার নিয়ে ছুটে এল। রেশমার অস্বস্তি লাগছে। এক্সট্রা মেয়ের জন্যে কোনো পরিচালক হুংকার দিয়ে চেয়ার আনায় না। রহস্যটা কী?

বোস। চা খাবে?

জ্বি না।

তাহলে ঠাণ্ডা কিছু খাও।

জ্বি না।

বার বার না বলবে না। বার বার না শুনতে ভালো লাগে না। ফ্লোরে কে আছে, ঠাণ্ডা কোক আন।

গ্লাসভর্তি কোক হাতে রেশমা জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। তার মাথা ঘুরছে, সে কিছুই বুঝতে পারছে না। আজমল তরফদার আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করেছেন। ফ্লোর-ব্যয় তার মাথার চুল টেনে দিচ্ছে।

রেশমা।

জ্বি।

তুমি মোবারক সাহেবকে চেন?

জ্বি না।

আজমল তরফদার চোখ মেললেন। টকটকে লাল চোখ দেখলেই ভয় লাগে। তিনি ভুরু কুচকে বললেন, মোবারক সাহেবকে চেন না?

জ্বি না।

জাহাজের ব্যবসা করেন যিনি সেই মোবারক। টেক্সটাইল মিল আছে–মোবারক টেক্সটাইলস–কোটিপতির ওপরে যদি কিছু থাকে সেই পতি।

জ্বি না, আমি চিনি না।

কোনোদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি?

জ্বি না।

ও আচ্ছা। ঠিক আছে এইটা জানার জন্যে।

আমি চলে যাব আজমল ভাই?

আচ্ছা যাও। শোন শোন তোমার পেমেন্ট হয়েছে?

জ্বি না, মিজান ভাই বলেছেন কোনো কাজ হয় নাই। সেজন্য পেমেন্ট হবে না।

তোমার পেমেন্ট হবে। অফিস থেকে পেমেন্ট নিয়ে যাও–আমি ম্যানেজারকে টেলিফোন করে দেব। আচ্ছা এখনি করছি।

আজমল তরফদার কর্ডের কোটের পকেট থেকে সেলুলার টেলিফোন বের করলেন। রেশমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। ব্যাপারটা কী।

আজ ম্যানেজার মুনশি রেশমাকে দেখামাত্র ভাউচার বই বের করল। রেশমা সই করতে গিয়ে দেখে পাঁচ শ টাকা লেখা। তার পেমেন্ট দিন হিসেবে। এক দিনে তার প্রাপ্য হয় আড়াই শ। দেয়া হচ্ছে পাঁচ শ।

মুনশি টাকা বের করতে করতে বলল, চা খাবেন?

এও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বাণী কথাচিত্রের ম্যানেজার মুনশি তাকে আপনি করে বলছে।

চা খাব না। আমার কাজ আছে। যাই?

জ্বি আচ্ছা।

তার কোনো কাজ নেই। শুটিং প্যাকআপ হওয়ায় সারাটা দিন তার হাতে। সেকেন্ড শিফটে কাজ হবে। সেকেন্ড শিফট কাগজে-কলমে বিকেল চারটা থেকে শুরু হলেও ফ্লোর ম্যানেজার বলে দিয়েছে কাজ শুরু হবে মাগরেবের নামায্যের পর। এই দীর্ঘ সময় এফডিসিতে বসে থাকার কোনো অর্থ হয় না। মবিন ভাইয়ের মেসে হুট করে চলে যাবে নাকি? অনেকদিন যাওয়া হয় না। এই সময় তাকে মেসেই পাওয়ার কথা। সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা আর রাত এই সময়গুলোতে মবিন ভাই ব্যস্ত থাকেন–প্রাইভেট পড়ান। বিকেলের আগ পর্যন্ত সময়টা অবসর।

মবিন ভাইয়ের জন্যে একজোড়া স্যান্ডেলও কেনা দরকার। তার স্যান্ডেলের যে অবস্থা। বাড়তি কিছু টাকা পাওয়া গেছে। যখন...।

স্যান্ডেল কেনার ব্যাপারটায় সে মনস্থির করতে পারছে না। তার টাকা-পয়সার খুব টানাটানি যাচ্ছে। চার মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছিল। ঐ দিনের দু'হাজার টাকা বাড়ি ভাড়ায় চলে গেছে। তারপরেও খালি হাতে মবিন ভাইয়ের কাছে যাওয়া যায় না।

কমদামি স্যান্ডেলও ছিল, সে ঝোঁকের মাথায় তিন শ পঁচিশ টাকা দিয়ে একজোড়া স্যান্ডেল কিনে ফেলল। মাপে হবে। এর আগের স্যান্ডেল জোড়াও তার কিনে দেয়া, সে মাপ জানে।

বাস প্রায় ফাঁকা। সে জানালার পাশে বসেছে। বাস দ্রুত চলছে। তার কেমন যেন শান্তি শান্তি লাগছে। অথচ শান্তি লাগার কিছু নেই। সে বুঝতে পারছে তার সামনে অনেক অশান্তি—মোবারক সাহেব হঠাৎ উদয় হয়েছেন কেন? সে ধরেই নিয়েছে তার জীবনের কিছু আলাদা অংশ আছে। মূল জীবনের সঙ্গে সেই জীবনের কোনো মিল নেই। মূল জীবনের সঙ্গে তা যুক্তও নয়। ওই জীবন তার নয়-অন্য একটা মেয়ের জীবন, যার নাম টেপী। সে টেপী নয়–সে রেশমাও নয়; সে মিতু। মোবারক নামের লোকটিকে টপী হয়তো চেনে, সে চেনে না।

জয়দেবপুর চৌরাস্তায় রেশমা বাস থেকে নামল। নেমেই সে মিতু হয়ে গেল। এক প্যাকেট ভালো সিগারেট কিনতে হবে। মানুষটার ভালো সিগারেটের এত শখ, টাকার অভাবে খেতে পারে না। পৃথিবীটা যদি এ রকম হতো— দোকান ভর্তি জিনিস থরে থরে সাজানো। যার যা প্রয়োজন উঠিয়ে নিয়ে যাবে, কাউকে কোনো টাকা দিতে হবে না। সিগারেট কেনার পর মিতুর মনে হলো–একটা কী যেন বাকি আছে। এর আগের বার মবিন ভাইয়ের কাছে যখন এসেছিল তখন ঠিক করে রেখেছিল। পরের বার আসার সময় অবশ্যই কিনে আনবে। এখন মনে পড়ছে না।

দরজির দোকানের ওপরে একটা ঘর নিয়ে মবিন থাকে। এক শ টাকা ভাড়া। ঘরে প্লাস্টার হয় নি–জানালা লাগানো হয় নি। জানালার খোলা অংশ করোগেটেড টিন দিয়ে বন্ধ। মবিনের ঘরে ওঠার সিঁড়ি অসম্ভব সরু। রোলিং নেই। সাবধানে উঠতে হয়। বর্ষাকাল বলে সিঁড়ি ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে। মিতু খুব সাবধানে উঠছে। তার হঠাৎ মনে হলো–এখন যদি দেখে মবিন ভাই নেই তখন কেমন লাগবে?

মবিন ঘরেই ছিল। সে দরজা খুলে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। মিতু বলল, দরজা ছাড়। দরজা ধরে থাকলে ভেতরে ঢুকবা কীভাবে?

মবিন বলল, হাত ধরে তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাই?

সেটা আবার কী?

খুব সম্মানিত যারা তাদের হাত ধরে ঘরে ঢোকাতে হয়।

আমি কি খুব সম্মানিত?

অবশ্যই।

তাহলে হাত ধরে নিয়ে যাও।

মবিন দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। হাত ধরল না। ধরবে না মিতু জানত। অশোভন কিছু কখনোই সে করবে না। মবিন বলল, পা তুলে আরাম করে বিছানায় বোস। তুমি কি দুপুরে খেয়ে এসেছ?

না।

তাহলে দুপুরে আমার সঙ্গে খাবে।

হোটেলের কুৎসিত খাবার? রবারের গোশত আর টকে যাওয়া ডাল?

মবিন হাসিমুখে বলল, ভালো খাবার। টিফিন কেরিয়ারে করে আসবে।

কোথেকে আসবে?

এক কনট্রাকটর সাহেবের বাসা থেকে। উনার বড় মেয়ে এসএসসি দেবে। তাকে এখন ইংরেজি শিখাচ্ছি–বিনিময়ে মাসে সাত শ টাকা পাচ্ছি প্লাস দু বেলা খাবার। রাতের খাবার ঐ বাসাতেই খাই–দুপুরেরটা তারা টিফিন কেরিয়ারে করে পাঠিয়ে দেয়।

তোমাকে এতে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ আনন্দিত। মহিলার রান্না অসম্ভব ভালো। যা রাঁধে তাই অমৃতের মতো লাগে। ঐদিন আলুভর্তা বানিয়ে পাঠিয়েছে। আলুভর্তার সঙ্গে সর্ষে বেটে দিয়েছে–আর দিয়েছে ধনেপাতা। এতগুলা ভাত খেয়ে ফেলেছি শুধু আলুভর্তা দিয়ে। আচ্ছা তুমি এ রকম শক্ত হয়ে বসছ কেন? আরাম করে বোস না।

আরাম করেই তো বসেছি।

আরো আরাম করে বোস। দেয়ালে হেলান দিয়ে বোস।

মিতু দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। মবিন বলল, তোমার খবর কী বল?

মিতু হাসিমুখে বলল, বলার মতো কোনো খবর নেই। তোমার খবর কী?

আমার দু'টা খবর আছে–একটা ভালো, একটা খারাপ। কোনটা আগে শুনতে চাও?

ভালোটাই আগে শুনি।

আমার ঘরের জানালা লাগানো হচ্ছে, এখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি আকাশ দেখতে পারব।

খারাপ খবরটা কী?

খারাপ খবর হলো–জানালা ফিট করায় ঘরের ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে। কত বাড়ছে বলতে পারছি না, তবে বাড়ছে...

মবিন হাসছে। মিতু মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। এভাবে দীর্ঘ সময় কারো দিকে তাকিয়ে থাকতে নেই–এতে যার দিকে তাকিয়ে থাকা হয় তার অমঙ্গল হয়। নজর লেগে যায়। মিতু চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, আমি তোমার জন্যে উপহার এনেছি। বল তো কী?

চিরুনি।

কী করে বুঝলে?

শেষবার যখন এসেছিলে তখন আমার চিরুনি দেখে বলে গেছ আমাকে একটা চিরুনি উপহার দেবে। এই আশায় আমি চিরুনি কিনি নি। আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়াই।

সত্যি আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়াও?

হুঁ।

আমি কিন্তু চিরুনি আনি নি। ভুলে গেছি। আমার মনে হচ্ছিল কী একটা জিনিস যেন ভুলে গেছি। তোমার জন্য একজোড়া স্যান্ডেল এনেছি।

সিগারেট? সিগারেট আন নি?

হুঁ।

দেখি দাও।

মিতু সিগারেটের প্যাকেট বের করে দিল। মবিন প্যাকেট হাতে নিতে নিতে বলল, আমাদের বিয়ের পরেও কি তুমি আমাকে উপহার দেবে?

আমি যতদিন বেঁচে থাকব, দেব।

কীসের শপথ?

সূর্য এবং চন্দ্রের শপথ।

সূর্য এবং চন্দ্রের নামে তো মানুষ চিরকাল শপথ নিচ্ছে–তুমি নতুন কিছুর নামে নাও।

কার নামে শপথ নিতে হবে তুমি বলে দাও।

শপথ হওয়া উচিত তোমার সবচে' প্রিয় জিনিসের নামে। তোমার সবচে' প্রিয় কী?

তুমিই আমার সবচে' প্রিয়।

ভালো করে ভেবেচিন্তে বল।

আমি রাতের পর রাত, দিনের পর দিন ভেবেছি। কাজেই আমি এখন শপথ করছি মবিনুর রহমানের নামে–আমি যত দিন বেঁচে থাকব...

শপথ বাক্য শেষ করার আগেই দরজা ঠেলে টিফিন কেরিয়ার হাতে ন' দশ বছর বয়সী একটা ছেলে ঢুকল। মবিন ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে উঠল— খাওয়া চলে এসেছে, খাওয়া। ছেলেটা বিস্মিত চোখে তাকাচ্ছে। মবিন বলল, এই ছেলের নাম বুড্ডা। নাম সুন্দর না?

মিতু কিছু বলল না। মবিন কথা বলার জন্যেই কথা বলছে। আনন্দিত মানুষ অকারণে কথা বলে। অকারণে অজস্র প্রশ্ন করে। সেই সব প্রশ্নের জবাব তারা আশা করে না। মিতুর খারাপ লাগছে সে শপথের অংশটা শেষ করতে পারেনি। শপথটা শেষ করতে পারলে তার নিজের ভালো লাগত। বুড্ডা নামের ছেলেটা কোমরে হাত দিয়ে কেমন অভিভাবক অভিভাবক চোখে তাকাচ্ছে। দেখেই মনে হচ্ছে বাসায় গিয়ে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলবে। মিতু বলল, তোমার বুড্ডা কি এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে?

মবিন বলল, হ্যাঁ। খাওয়া শেষ হলে টিফিন কেরিয়ার নিয়ে চলে যাবে।

ওকে চলে যেতে বল, ওর সামনে বসে আমি খাব না।

বুড্ডা তুমি চলে যাও, আমি সন্ধেবোলা টিফিন কেরিয়ার নিয়ে যাব।

আইজ আফনেরে যাইতে নিষেধ করছে। আইজি আফার শইল খারাপ।

আচ্ছা যাব না। তুমি পরে এসে টিফিন কেরিয়ার নিয়ে যাবে।

ছেলেটা নিতান্ত অনিচ্ছায় চলে যাচ্ছে। মিতু বলল, রাতে তোমাকে যেতে নিষেধ করল, রাতে তুমি খাবে কোথায়?

ওরা খাবার পাঠিয়ে দেবে।

মিতু দেখল মবিন খুব আগ্রহ নিয়ে খবরের কাগজ বিছাচ্ছে, টিফিন কেরিয়ারের বাটি সাজাচ্ছে। ঘরে একটাই প্লেট। সেটা মিতুকে দেয়া হলো। মবিন বাটিতে খাবে। আয়োজন

অনেক–বেগুন ভাজা, মাছ ভাজা, ঝাল ঝাল করে রান্না করা গরুর গোশত, দু'রকমের ডাল। মবিন খুশি খুশি গলায় বলল, এদের ডাল রান্না অসাধারণ হয়। তোমাকে একদিন ঐ মহিলার কাছে নিয়ে যাব। ডাল রান্না শিখে আসবে। রেসিপি কাগজে-কলমে লিখে আনলে কিছু হয় না, এসব শিখতে হয় হাতে-কলমে। যাবে একদিন আমার সাথে?

যাব।

ডালটা একটু চেখে দেখা—-অসাধারণ কিনা বল।

হুঁ অসাধারণ।

ডাল রান্নার ওপর এই মহিলাকে অনায়াসেই একটা পিএইচ.ডি. ডিগ্রি দিয়ে দেয়া যায়।

এই টিউশ্যানিটা পেয়ে তুমি মনে হয় সুখেই আছ।

খাওয়াদাওয়ার দিক দিয়ে আরামে আছি–তবে ছাত্রী পড়িয়ে কোনো আরাম পাই না।

কেন?

যতক্ষণ পড়াই ততক্ষণ ছাত্রীর মা কাছেই একটা চেয়ারে কঠিন কঠিন চোখ করে বসে থাকেন। মেয়েকে পাহারা দেন। যেদিন তিনি থাকেন না সেদিন অন্য কেউ থাকে। নিজেকে খুব ছোট লাগে।

মিতু হালকা গলায় বলল, তারা জানে না তোমার চরিত্র সাধু-সন্ন্যাসীর মতো। জানলে মেয়ের জন্যে পাহারার ব্যবস্থা করত না।

আমার চরিত্র সাধু-সন্ন্যাসীর মতো! কী যে তুমি বল! সাধু-সন্ন্যাসীদের বেশিরভাগই চরিত্রহীন। তুমি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো পড় নি, পড়লে বুঝতে ওদের ঋষিরা কী চীজ-হা-হা-হা।

খাওয়ার সময় এ রকম শব্দ করে হাসবে না। বিষম লাগবে।

ভাতে কি কম পড়বে?

না, কম পড়বে না।

দেখেছি। এরা কেমন চাল খায়। এ চালের নাম হচ্ছে কাটারিভোগ। বিয়ের পর আমরা যখন সংসার পাতব তখন এই কাটারিভোগ চালই খাব। দু'জন মানুষ, চাল তো বেশি লগবে না, কী বল?

মিতু জবাব দিল না। মবিন বলল, মাসে পনের কেজি চালের বেশি তো আমাদের লাগবে না। কাটারিভোগের কেজি কত করে তুমি জান?

জানি না। আচ্ছা, খাওয়াদাওয়া ছাড়া অন্য কোনো গল্প করলে কেমন হয়?

খুব ভালো হয়।

বেশ তাহলে অন্য গল্প বল।

অন্য গল্প তুমি বল–আমি শুনি।

আমার তো সব ছবির লাইনের গল্প। এসব গল্প শুনতে তোমার ভালো লাগবে না।

খুব ভালো লাগবে। তুমি যা বল। তাই শুনতে ভালো লাগে। কারণ কি জান?

না।

তোমার গলার স্বর অদ্ভুত সুন্দর। মনে হয় বাজনা বাজছে।

কী বাজনা–ঢোল?

জলতরঙ্গ।

সেটা আবার কী বাজনা?

চিনামাটির বাটিতে পানি ভর্তি করে কাঠি দিয়ে বাজায়। অনেকগুলো বাটি নেয়া হয়। বাটিতে পানির পরিমাণ বাড়িয়ে-কমিয়ে শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক করা হয়। মন্দ্র সপ্তক থেকে...

উফ! বক বক বন্ধ করা তো।

মবিন হেসে ফেলল। মিতু বলল, তোমার একটাই সমস্যা–কোনো কথা শুরু করলে সেটাকে জ্ঞানের কথায় নিয়ে ফেলবে। জ্ঞানের কথা কি আমার মতো সাধারণ মানুষের ভলো লাগে? হাত কোথায় ধোব? তোমার বাথরুম কোথায়?

বাথরুম নিচে-অনেক দূরে। তুমি বাটির মধ্যে হাত ধোও। পান খাবে? মিষ্টি পান, নিয়ে আসি।

কিছু আনতে হবে না। তুমি চুপ করে বোস আর ক্রমাগত কথা বলে যাও।

জ্ঞানের কথা?

না, মজার মজার কথা।

আমার কোন কথাগুলো তোমার মজা লাগে তাও তো জানি না। বরং তুমি তোমার বিখ্যাত জলতরঙ্গ কণ্ঠে গল্প বল আমি শুনি।

ফিল্ম লাইনের গল্প?

ফিল্ম লাইনের গল্পই তো সবচে' ইন্টারেস্টিং হওয়ার কথা।

ফিল্ম লাইনের ভয়ংকর সব গল্প আছে, শুনলে তোমার মনটন খারাপ হয়ে যাবে–যেমন ধর, একটা মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, টেপী তার নাম। আমার মতোই ছোটখাটো পার্ট করে। তারা তিন বোন...

ফিল্ম লাইনের মেয়ের নাম টেপী, অদ্ভুত তো। এই লাইনে নামের খুব বাহার থাকার কথা– নীলাঞ্জনা চৌধুরী টাইপ।

ও তো নায়িকা না যে নামের বাহার থাকবে। ও হচ্ছে অতি নগণ্য এক্সট্রা মেয়ে। পোস্টারে এদের নাম যায় না, পর্দায় টাইটেলেও নাম যায় না। কাজেই এদের নাম টেপী হোক বা নীলাঞ্জনা চৌধুরী হোক কিছুই যায় আসে না।

তারপর বল।

কী বলব?

টেপী সম্পর্কে কী বলতে চাচ্ছিলে বল।

ও আচ্ছা–ওরা তিন বোন–হ্যাপী টেপী, পেপী। টেপী মেজ। ফিল্মে কাজ করে সে তার সংসার চালায়, মাঝে মাঝে তাকে অন্য কিছুও করতে হয়। অন্য কিছুটা কী তুমি বুঝতে পারছি?

মনে হয় পারছি।

যাক, তোমার বুদ্ধি তাহলে আমার চেয়ে বেশি। আমাকে প্রথম যখন টেপী বলল, মাঝে মাঝে আমি অন্য কিছু করি–তখন আমি বুঝতে পারিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অন্য কিছু কী করা? সে তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে এমন কান্না শুরু করল!

মেয়েটির সঙ্গে তোমার কি খুব ভাব?

খুব ভাব না। মোটামুটি ভাব। ফিল্ম লাইনে কারো সঙ্গেই খুব ভাব হয় না। আজ হুট করে তোমার এখানে আসার কারণ কী জান? কারণ হলো টেপী।

বুঝলাম না–বুঝিয়ে বল।

আজ মর্নিং শিফটের শুটিং হঠাৎ করে প্যাকআপ হয়ে গেল। টেপী বলল, আপা চল ক্যান্টিনে চা খাই।

তোমাকে আপা ডাকে? বয়সে তোমার ছোট?

সমানই হব। তবু কেন জানি আপা ডাকে। যাই হোক। ওর সঙ্গে চা খেতে গিয়েছি সেখানে হঠাৎ সে এমন কান্না শুরু করল...।

কেন?

জানি না কেন? আমি জিজ্ঞেস করি নি। আমার এত মন খারাপ হলো–ভাবলাম তোমার কাছে এলে হয়তো মন ভালো হবে।

মন ভালো হয়েছে?

প্রথমে হয়েছিল। এখন আবার মন খারাপ লাগছে।

কেন?

মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল। এই জন্যে। আমি একবার ওকে তোমার কাছে নিয়ে আসব।

আমার কাছে কেন?

কোনো কারণ নেই, এমনি আনিব। তোমার টিফিন কেরিয়ার, বাটি এইসব ধুয়ে দিচ্ছি–পানি কোথায় বল তো? নিচে যেতে হবে?

তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। তুমি চুপ করে এখানে বসে থাক।

আমি পা তুলে চুপচাপ বসে থাকব। আর তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে থালাবাসন ধুবে–ভাবতেও ঘেন্না লাগছে।

ঘেন্না লাগার কিছু নেই–বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর; অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

থালাবাসন ধোয়া এমন কিছু মহান সৃষ্টি না।

বিশ্বে যা কিছু সাধারণ সৃষ্টি চিরকল্যাণকর; থ্রি-ফোর্থ তার করিয়াছে নারী ওয়ানফোর্থ তার নর।

মবিন হো-হো করে হাসছে। তার সারা শরীরে আনন্দ ঝলমল করছে। মিতুর চোখ ভিজে উঠছে। কেন ভিজে উঠছে সে নিজেও জানে না। মবিনকে এই চোখের পানি দেখতে দেয়া

যাবে না। তাকে মুখ ঘুরিয়ে বসতে হবে। এই ঘরের কোনো জানালা নেই, জানালা থাকলে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো যেত। ভেজা চোখ নিয়ে আকাশ দেখতে ভালো লাগে।

মোবারক সাহেবের খাস কামরা

অফিসে মোবারক সাহেবের দু'টা খাস কামরা। একটা হলঘরের মতো বিশাল। ওয়াল টু ওয়াল ধবধবে সাদা কর্পেটে মোড়া। এক কোণায় দশ ফুট বাই ছ'ফুটের মেহগনি কাঠের কালো একটা টেবিল। টেবিলের ওপাশে মোবারক সাহেবের নিচু রোলিং চেয়ার। দেয়ালে বেশ কিছু পেইনটিং। পেইনটিঙের ফ্রেমগুলোও কালো মেহগনি কাঠের। ইন্টারন্যাল ডিজাইনার মেঝের সাদা কার্পেটের সঙ্গে কালো ফার্নিচারের একটা কম্বিনেশন করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন–কম্পোজিশন ইন ব্ল্যাক এন্ড হেয়াইট। এই ঘরে যে চায়ের কাপে চা দেয়া হয় তার রং পর্যন্ত কালো। পিরিচগুলো সাদা।

এই খাস কামরা মোবারক সাহেব সচরাচর ব্যবহার করেন না–তিনি ব্যবহার করেন বাড়ির চিলেকোঠার খাস কামরা। তুলনামূলকভাবে ঘরটা ছোট-তবে কোনো আসবাব নেই বলে ছোট ঘরও অনেক বড় মনে হয়। বসার জন্যে ঘরে ছোট ছোট কাপেট পাতা আছে। ইটালিয়ান পার্লার মার্কেলের মেঝেতে হালকা নীল রঙের কার্পেট। ঘরে কোনো টেবিল নেই–শুধু মোবারক সাহেবের সামনে মারোয়াড়ি দোকানের ক্যাশ বাক্সের মতো ছোট্ট একটা মার্কেলের টেবিল। বড় বড় কাচের জানালায় পর্দা নেই বলেই ছাদের গোলাপ বাগান চোখে পড়ে। সেই বাগান দর্শনীয়।

আজমল তরফদার জুতা পায়ে মোবারক সাহেবের এই ঘরে ঢুকে দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। মোবারক সাহেব হাসিমুখে বললেন, এত অপ্রস্তুত হবার কিছু নেই। জুতা পায়ে অনেকেই ঢুকে পড়ে। আমি নিজেও কতবার ঢুকেছি।

মেঝেতে ময়লা লেগে গেল।

লাগুক না। মেঝের ময়লা পরিষ্কার করা যায়। আসুন, বসুন আমার সামনে। মেঝেতে বসে অভ্যাস আছে তো? চেয়ার-টেবিল আসার পর থেকে বাঙালি মেঝেতে বসা ভুলে গেছে।

আজমল তরফদার এসে বসলেন। তিনি বসে আরাম পাচ্ছেন না। জিনসের প্যান্টে আঁটসাঁট লাগছে। মোবারক সাহেব বললেন, কী খাবেন বলুন?

এক কাপ চা খেতে পারি।

দুপুরে লাঞ্চের আগে চা খেয়ে খিদে নষ্ট করবেন কেন? শরবত খান। তেঁতুলের একটা শরবত আছে–আমার খুব প্রিয়। আপনার পছন্দ হলে রেসিপি দিয়ে দেব।

থ্যাংক য়্যু স্যার।

এখন ছবির বিষয়ে বলুন।

কী বলব স্যার?

আপনাকে নিশ্চয়ই বলা হয়েছে। আমি একটা ছবি বানাতে চাই।

জ্বি লোকমান সাহেব আমাকে বলেছেন।

সেই প্রসঙ্গে বলুন।

আজমল তরফদার কী বলবেন ভেবে পেলেন না। তাঁর প্রচণ্ড সিগারেটের তৃষ্ণা হচ্ছে কিন্তু এই ঘরের যে অবস্থা তাতে মনে হয় না। এখানে সিগারেট খাওয়া যাবে। ভদ্রলোক শরবতের কথা বলেছেন। অথচ কাউকে শরবত দিতে বলেন নি। ভুলে গেছেন বোধহয়। ঠাণ্ডা এক গ্লাস শরবত পেলে ভালোই হতো।

ছবির কোন ব্যাপার জানতে চান?

সবই জানতে চাই।

কী পরিমাণ টাকা লাগবে তা দিয়ে শুরু করি?

করুন।

ছবির জগতে আপার লিমিট বলে কিছু নেই। কেউ ইচ্ছা করলে একটা ছবি বানাতে পাঁচ কোটি টাকাও খরচ করতে পারে।

আপার লিমিট না থাকলেও লোয়ার লিমিট নিশ্চয়ই আছে?

জ্বি তা আছে। জিনিসপত্রের দাম–আর্টিস্টদের পেমেন্ট যে হারে বেড়েছে তাতে স্যার একটা ছবির পেছনে প্রায় এক কোটি টাকা লগ্নি করতে হয়।

এক কোটি টাকায় ছবি হয়ে যাবে?

জ্বি হবে। একটু টাইট বাজেটে করতে হবে। হাত-পা খেলিয়ে করা যাবে না।

হাত-পা খেলিয়ে করতে কত লাগবে?

তার সঙ্গে আরো পঞ্চাশ লাখ যোগ দিন।

বেশ, আমি এক কোটি পঞ্চাশ লাখ খরচ করব।

আজমল তরফদার কিছুটা হকচাকিয়ে গেলেন। কিছু কিছু মানুষের হাতে টাকা আছে তা তিনি জানেন। সেই টাকা কোন পর্যায়ে আছে তা জানেন না। কালো টাকাকে সাদা করার জন্যে অনেকে ছবি করে। এই ভদ্রলোকের কালো টাকার পরিমাণ কত? ধন্যবান ব্যক্তিদের গা থেকে একটা আলগা চাকচিক্য ঝিলিক দেয়, ইনার তা নেই। সাদামাটা চেহারা–মুখের চামড়ায় ভাজ। পায়জামা পাঞ্জাবি পরে থাকায় স্কুল টিচার স্কুল টিচার বলে মনে হচ্ছে।

স্যার আপনি কী ধরনের ছবি করতে চান? কমার্শিয়াল ছবি, না। আর্ট ছবি?

পার্থক্য কী বুঝিয়ে বলুন।

মানিকদার ছবি হলো–আর্ট ছবি।

মানিকদাটা কে?

সত্যজিত রায়। টালীগঞ্জে একটা ছবি করতে গিয়েছিলাম, তখন উনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আমাকে খুব স্নেহ করতেন।

ও আচ্ছা।

‘পথের পাঁচালী’ টাইপ ছবি হলে নাম হবে, তবে হলে ছবি চলবে না। ইন্টারভ্যালের আগেই দর্শক বের হয়ে চলে আসবে। লগ্নি করা টাকা উঠে আসবে না। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়া যাবে। বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবি যাবে, ছবির সঙ্গে সঙ্গে ছবির প্রযোজক হিসেবে আপনিও যাবেন। এই পর্যন্তই...

আজমল তরফদারের কথার মাঝখানেই শরবত চলে এল। বড়ো সাইজের গ্লাসঈষৎ সবুজাভ রঙের পানীয়, উপরে বরফের টুকরা ভাসছে। শরবত এসেছে। একজনের জন্যে। মোবারক সাহেব বললেন, নিন শরবত নিন।

আপনি খাবেন না স্যার?

জ্বি না। আর্ট ছবি সম্পর্কে তো বললেন, এখন কমার্শিয়াল ছবি সম্পর্কে বলুন।

বলার কিছু নেই স্যার। ধুমধাড়াক্কা টাইপ ছবি। নাচ-গান-যৌনতা, যাত্রা ঢঙের অভিনয়, কিছু ভাঁড়ামি, কিছু চোখের পানি ... বারমিশালি খিচুড়ি।

লোকজন খিচুড়ি খাচ্ছে?

না খেলে এত ছবি বানানো হবে কেন? খিচুড়ি খাচ্ছে। যারা সিনেমা হলে যাচ্ছে তারা খিচুড়ি ছাড়া অন্য কিছুই খাবে না।

ছবি বানানো হচ্ছে কাদের জন্যে?

রিকশাওয়ালা, গ্রামের চাষী, কুলি, মজুর। এদের জন্যে–এদের বাড়িতে টিভি নেই, বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই–সারাদিন পরিশ্রম করে সিনেমা হলে এসে সিটি বাজিয়ে একটু আরাম পায়। ছবি বানিয়ে ব্যবসা করতে হলে এদের জন্যে ছবি বানাতে হবে। এখন স্যার ঠিক করতে হবে। আপনি কাদের জন্যে ছবি বানাবেন?

আমি ব্যবসায়ী মানুষ। দেড় কোটি টাকা যখন আমি ইনভেষ্ট করব তখন আশা করব। তিন কোটি টাকা প্রফিট।

অবশ্যহ করবেন।

এখন আপনি বলুন আমার এই ছবি পরিচালনা করতে আপনি কত টাকা নেবেন?

আমার এখন পর্যন্ত কোনো ছবি নরম যায় নি। সব ছবি ব্যবসা করেছে। লাস্ট তিনটা ছবির তিনটাই সুপারহিট হয়েছে। আগে আমি তিন লাখ করে নিতাম। লাস্ট দু'টা ছবিতে সাত লাখ নিয়েছি। আপনিও তাই দেবেন।

শরবত খেতে কেমন লাগল?

আজমল তরফদার একটু হকচাকিয়ে গেলেন। হঠাৎ শরবতের প্রসঙ্গ চলে এল কেন বুঝতে পারলেন না।

শরবত খুব ভালো লেগেছে। ঝঁজ আছে।

রেসিপিটা হচ্ছে–এক জগ পানিতে এক ছটাক তেঁতুল এবং এক টেবিল চামচ সৈন্ধব লবণ, কুচিকুচি করে কাটা দু'টা কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা, কয়েক দানা জিরা চব্বিশ ঘণ্টা না নেড়ে রেখে দিতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টা পর ছেকে আলাদা করতে হবে। তার সঙ্গে পরিমাণ মতো চিনি মিশিয়ে আধা পেগ ভদকা দিতে হবে।

এর মধ্যে ভদকা আছে?

হ্যাঁ সামান্য আছে, আধা পেগেরও কম। আপনি মদ্যপান করেন না?

তেমন অভ্যোস নেই। মাঝেমধ্যে হঠাৎ ... ছবির আলাপটা স্যার শেষ করি। আমার আরো কিছু জরুরি কাজ আছে।

মোবারক সাহেব শান্ত গলায় বললেন, ছবির আলাপ অবশ্যই শেষ করবেন–আমি একটু শুধু ইন্টারফেয়ার করব–আপনি যে বললেন সাত লাখ টাকা পারিশ্রমিক নেন; শেষ দু'টা ছবিতে তাই নিয়েছেন তা তো ঠিক না। আমি খোঁজখবর নিয়েই কথা বলার জন্যে আপনাকে ডেকেছি। এখন পর্যন্ত কোনো ছবিতেই আপনি তিন লাখ টাকার বেশি পারিশ্রমিক পান নি। শেষ ছবিতেই চার লাখ টাকায় কনট্রাক্ট সাইন করেছেন। পেয়েছেন দুলাখ। দু লাখ এখনো পান নি। না পাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। আমি একজন ব্যবসায়ী, দেড় কোটি টাকার একটা প্রজেক্টে হাত দেব–ভালোমতো খোঁজখবর না করেই এগুব তা ভাবলেন কীভাবে? আপনি কি আরেক গ্লাস শরবত খাবেন?

জ্বি স্যার খাব।

এখন বলুন ছবি শেষ করতে আপনার কতদিন লাগবে?

আজমল তরফদারের চিন্তাভাবনা একটু এলোমেলো হয়ে গেছে। স্কুল টিচারের মতো দেখতে এই লোক সহজ লোক না। কঠিন লোক। কঠিন লোকের হয়ে কাজ করায় আনন্দ আছে। এরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়।

আজমল তরফদার আরেকটা ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করছেন। দ্বিতীয়বার শরবতের কথা তাকে বলা হয়েছে কিন্তু খবরটা ভেতরে দেয়া হয় নি। তারপরেও আজমল তরফদারের ধারণা যথাসময়ে শরবতের গ্লাস চলে আসবে। যদি আসে তাহলে ধরে নিতে হবে মোবারক হোসেন নামের এই লোক শুধু কঠিন ব্যক্তি না–সূক্ষ্ম চালের ক্ষমতা আছে এমন এক ব্যক্তি।

মোবারক সাহেব বললেন, আপনার বোধহয় সিগারেট খাবার অভ্যাস আছে। অভ্যাস থাকলে খেতে পারেন। আমিও মাঝেমধ্যে খাই।

তিনি তাঁর সামনে ছোট্ট ডেস্ক টাইপ টেবিলের ড্রয়ার খুলে অ্যাশট্রে বের করে সামনে রাখলেন। আজমল তরফদার ভুরু কুঁচকে ফেললেন। কথাবার্তার ঠিক এই পর্যায়ে ড্রয়ার থেকে অ্যাশট্রে বের করা হবে এটা কি আগেই ঠিক করা?

মোবারক সাহেব একটু ঝুকে এসে বললেন, আমি আপনাকে দিয়ে ছবি বানাব বলে ঠিক করে রেখেছি। আপনার রেমুনারেশন হিসেবে আমি পাঁচ লাখ টাকা ভেবে রেখেছি। এই অ্যামাউন্টের টাকার একটা চেক তৈরি করা আছে। আপনি রাজি থাকলে আজই আপনাকে দিয়ে দেব।

পুরোটা একসঙ্গে দিয়ে দেবেন?

হ্যাঁ। এবং ছবি যদি সুপারহিট হয় তাহলে আপনাকে আরো দু লাখ দেয়া হবে। আপনি কি রাজি আছেন?

রাজি আছি।

কতদিনে ছবি তৈরি করে দেবেন?

আমি ছ'মাসে ছবির সেন্সরপ্রিন্ট দিয়ে দেব। এবং ইনশাআল্লাহ্ ছবি সুপারহিট করবে। তবে একটা শর্ত–ছবি আমার মতো করে বানাতে দিতে হবে।

তা দেব। শুধু টাকা-পয়সা আমার লোকজন হ্যান্ডেল করবে। এবং নায়িকা হিসেবে আমার পরিচিত একটি মেয়ে থাকবে। আপনি তাকে চেনেন। আপনার বর্তমান ছবিতে কাজ করছে। রেশমা।

রেশমা?

হ্যাঁ।

আপনি স্যার দেড় কোটি টাকা খরচ করছেন, ইচ্ছে করলে বর্তমানের সবচে' হিট নায়িকা নিতে পারেন।

আমি ঐ মেয়েটিকে নিতে চাচ্ছি।

স্যার কিছু মনে করবেন না। ওর চেহারায় গ্ল্যামার নেই। ছবির জগতটাই হলো গ্ল্যামারের।

ফিল্ম লাইনের মেকআপ দিনকে রাত করতে পারে। সামান্য গ্ল্যামার আনতে পারবেন না?

সে রকম মেকআপম্যান স্যার আমাদের নেই।

না থাকলে বাইরে থেকে নিয়ে আসুন। মাদ্রাজ থেকে আনুন, বোম্বে থেকে আনুন। প্রয়োজন মনে করলে হলিউড থেকে আনুন।

শরবত চলে এসেছে। আজমল তরফদার অস্বস্তির সঙ্গে শরবতের গ্রাস হাতে নিলেন। তাঁর কাছে মনে হলো–পাঞ্জাবি গায়ে বসে থাকা ছোটখাটো মানুষটা আসলে মাকড়সার মতো। সূক্ষ্ম জাল ফেলে রাখে। সে জাল চোখে দেখা যায় না। জালে জড়িয়ে পড়ার পরই শুধু জালটা স্পষ্ট হয়।

আজমল সাহেব।

জ্বি স্যার।

এই নিন। আপনার চেক।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে চেক বের হলো। আজমল তরফদার হাত বাড়িয়ে যন্ত্রের মতো চেকটা নিলেন। চাপা গলায় বললেন, আপনার সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হবে?

আর দেখা হবে না। আমার লোক আপনার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবে।

যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজন পড়ে?

প্রয়োজন পড়লে আমি আছি। আমি তো দেশেই থাকি। তবে নানান কাজে ব্যস্ত থাকি।

ছবির গল্প কি আমিই সিলেক্ট করব?

অবশ্যই আপনি করবেন।

আপনাকে দেখানোর কোনো দরকার নেই?

না।

এফডিসির ক্যামেরা না নিয়ে প্রাইভেট পার্টির ক্যামেরা দিয়ে যদি কাজ করি আপনার আপত্তি আছে? জার্মানির এরি থ্রি ক্যামেরা। নতুন এসেছে। এরা টাকা একটু বেশি নেবে কিন্তু কাজ হবে খুব ভালো।

আপনি কাজ করবেন স্বাধীনভাবে। আমি বা আমার লোকজন কখনোই আপনার স্বাধীন কাজে বাধা দেবে না।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

আজমল তরফদার উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পা সামান্য টলছে। সম্ভবত পার পর দু'পেগ ভদকার জন্যে এটা হয়েছে। ভদকা হঠাৎ করে 'কিক' দেয়। এটা কি ভদকার কিক, না অন্য কিছু? স্কুল টিচারের মতো দেখতে এই লোকটা তাকে নার্ভাস করে দিয়েছে।

স্যার।

বলুন।

আর্টিস্টদের সঙ্গে কি যোগাযোগ করব?

স্টোরি লাইন ঠিক হবার আগে আর্টিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কীভাবে?

এদিকের নিয়ম হচ্ছে স্যার–আগে আর্টিস্ট ঠিক করা হয় তারপর স্টোরি লাইন।

নিয়ম যা তাই করবেন। তবে রেশমা মেয়েটিকে কিছু বলার দরকার নেই। আমি ডিসিশান বদলাতেও পারি।

যদি কিছু মনে না করেন স্যার তাহলে ডিসিশান বদলানো ভালো হবে। সম্পূর্ণ নতুন মেয়ে নেয়া এক কথা আর দিনের পর দিন এক্সট্রার রোল করছে এমন একজনকে নেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। নতুন একজন নায়িকার জন্যে দর্শকদের কৌতুহল আছে। এক্সট্রা মেয়েদের জন্যে দর্শকদের কৌতুহল নেই। স্যার যাই।

মোবারক সাহেব জবাব দিলেন না। আজমল তরফদারের পা সত্যি সত্যি টলছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি প্রয়োজনের চেয়েও বেশি বার 'স্যার' 'স্যার'

করেছেন। এত ‘স্যার’ ‘স্যার’ করার কোনো দরকার ছিল না। এটা তো আর মিলিটারি একাডেমি না যে স্যারের উপর দুনিয়া চলবে।

মোবারক সাহেব ঘরে একা বসে আছেন। আজমল তরফদার নামের সিনেমায় এই লোক তাকে খুব বিরক্ত করেছে। লোকটার চোখে কোনো অসুখ আছে। টকটকে লাল চোখ। তিনি লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হচ্ছিলেন। বিরক্তি অনেক বাড়ল যখন সে মিথ্যা কথা বলে তার পাওনা বাড়াতে চাইল। লোভীর মতো লোকটির চেক নেয়াটাও চোখে লেগেছে।

পৃথিবীর সবচে’ অসুন্দর দৃশ্য হলো লোভে চকচক করা চোখ। আর সবচে’ সুন্দর দৃশ্য গভীর মমতায় আর্দ্র প্রেমিকার চোখ। তিনি দীর্ঘদিন লোভে চকচক করা চোখ দেখছেন। দেখে দেখে তিনি খানিকটা ক্লান্ত। তবে লোভী মানুষদের একটা ভালো দিক আছে। কোনো লোভী মানুষই আত্মহত্যার কথা ভাবে না। লোভ তাদের বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণা জোগায়। তিনি লোভী হলে ভালো হতো, বেঁচে থেকে আনন্দ পেতেন। এখন বেঁচে থেকে কোনো আনন্দ পান না। আনন্দের জন্যে অতি নিম্নস্তরের কিছু কাণ্ড তিনি করছেন। তাতে তেমন লাভ হচ্ছে কি?

লোকমান উঁকি দিল। তিনি সহজ গলায় বললেন, কিছু বলবে লোকমান?

লোকমান বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আপনি ডাক্তার সাহেবকে আসতে বলেছেন, উনি এসেছেন।

এখানে নিয়ে এস।

দুপুরের খাবার কি স্যার এখানে দেব?

দাও। ডাক্তারকেও আমার সঙ্গে খেতে বলেছিলাম।

জ্বি স্যার জানি।

ডাক্তার আবদুর রশীদ ইএনটি স্পেশালিস্ট। মোবারক সাহেবের নাক-কান-গলার কোনো সমস্যা নেই। তবু রশীদ সাহেবকে তিনি প্রায়ই খবর দিয়ে আনেন কথা বলার জন্যে। রশীদ সাহেব ভদ্রলোকের অনেক ক'টা বিলিতি ডিগ্রি আছে কিন্তু প্র্যাকটিস নেই। ইএনটি স্পেশালিস্টরা রোগী সামলাতে হিমশিম খান। রশীদ সাহেবের সেই সমস্যা নেই। তার বেশিরভাগ সময় কাটে খবরের কাগজ পড়ে। তিনি চারটি খবরের কাগজ রাখেন। চেম্বারে বসে চারটা খবরের কাগজ পড়ারই তাঁর সময় হয়।

এই মানুষটির বিস্মিত হবার ক্ষমতা অসাধারণ। মোবারক সাহেব মাঝেমধ্যে তাকে খবর দিয়ে আনেন। সামান্য ব্যাপারে ভদ্রলোককে বিস্মিত হতে দেখেন। তার ভালো লাগে। মেডিকেল কলেজের একজন নামি অধ্যাপক–তাকে তো আর যখন তখন খবর দিয়ে আনা যায় না। অসুখের একটা অজুহাত দাঁড় করিয়ে খবর দিতে হয়। রোগ দেখানোর পর অবিশ্বাস্য অঙ্কের একটা চেক তাঁর হাতে দেয়া হয়। তিনি চেকটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ খুব হৈচৈ করেন–করেছেন কী! পত্রিকাওয়ালারা জানলে তো নিউজ করে ফেলবে। অসম্ভব, এই চেক আমি নিতে পারি না। আপনার যদি টাকা বেশি হয়ে থাকে এবং দান করতে

যদি কষ্ট হয় তাহলে দয়া করে টাকাগুলো পুড়িয়ে ফেলুন। আমাকে নষ্ট করবেন না। আমি এমনিতেই নষ্ট।

ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত চেকটা নেন। এবং ছেলেমানুষের মতো বলে ফেলেন–চেকটা পেয়ে খুব উপকার হয়েছে, প্র্যাকটিস বলতে কিছুই নাই। চেম্বারে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেখেছিলাম, তিন মাস বেতন না দেয়ায় চলে গেছে। শুধু হাতে যায় নি, আমার ইন্সট্রুমেন্ট বক্স নিয়ে পালিয়ে গেছে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দামের ইন্সট্রুমেন্ট।

রশীদ সাহেব ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, মোবারক সাহেব, আবার আপনার কী হলো?

ঢোক গিলতে ক'দিন ধরে সমস্যা হচ্ছে।

টনসিলাইটিস নাকি? হাঁ করুন তো।

এক্ষুণি হাঁ করব না। খানিকক্ষণ গল্পগুজব করুন তারপর হাঁ করি।

আরে সর্বনাশ! এগুলো কি গোলাপ নাকি। আপনি করেছেন কী–ছাদে দেখি আমার আগুন লাগিয়ে ফেলেছেন! দু'টা মিনিট সময় দিন আমি একটু বাগানটা দেখে আসি।

রশীদ সাহেব গভীর আনন্দে গোলাপ দেখে বেড়ান। মোবারক সাহেব তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে। রশীদ সাহেবকে তিনি ব্যবহার করেন। ঠিক একইভাবে তিনি আরো অনেককে ব্যবহার করেন। কিন্তু তারপরেও তাঁর কিছুই ভালো লাগে না। পর পর দু'বার তিনি তিনতলার বারান্দা থেকে নিচে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

পড়েন নি। আরো একবার একরকম কিছু হবে। সেই বার তিনি হয়তো সত্যি সত্যি লাফিয়ে পড়বেন।

জীবনের বৈচিত্র্যের জন্যে টেপীর মতো মেয়েদের তিনি মাঝে মাঝে নিয়ে আসেন। তাদের কেউ কেউ অদ্ভুত সব কাণ্ড করে। কিছুক্ষণের জন্যে জীবনটা ইন্টারেস্টিং মনে হয়–তারপর আবার সেই ক্লান্তিকর দীর্ঘ দিবস। দীর্ঘ রাজনী। একবার বাইশ-তেইশ বছর বয়সী একটি মেয়ে এসেছিল। সে ভয়ে এবং লজ্জায় মরে যাচ্ছে। বিছানার এক কোণায় বসেছিল। মোবারক সাহেবকে দেখেই চট করে উঠে দাঁড়াল। হড়বড় করে বলল, আমি ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারি না। আমি কিন্তু কাপড় খুলব না।

সেদিন তিনি প্রাণ খুলে হেসেছিলেন। মেয়েটিকে কাপড় খুলতে হয় নি। তিনি তাকে কফি বানিয়ে খাইয়েছেন। যতদূর মনে পড়ে তাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তাকে বলেছিলেন, তোমার যখনই টাকা-পয়সার সমস্যা হবে তুমি আমার কাছে আসবে, টাকা নিয়ে যাবে।

মেয়েটি আর আসে নি। তিনি খবর নিয়েছিলেন। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। সে স্বামীর সঙ্গে জামালপুরে থাকে। সে সুখেই আছে। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই সুখে থাকে। অল্প কিছু লোক থাকে অসুখী–তারা শুধু সুখী মানুষ খুঁজে বেড়ায়।

ঝুমুর আজ স্কুলে যায় নি

ঝুমুর আজ স্কুলে যায় নি। বিকেল তিনটায় সে আপাকে সঙ্গে নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে। সে সকাল থেকেই অস্বস্তি নিয়ে ঘুরছে। সেন্ট্রাল জেলের গেটে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে তার কুৎসিত লাগে। চারপাশে থাকে গাদাগাদি ভিড়। দর্শনাথীর চেয়ে বাইরের লোক বেশি। এরা এমন ভঙ্গিতে তাকায় যেন যারা দেখা করতে এসেছে তারাও অপরাধী।

সবচে’ খারাপ লাগে যখন তারা গরাদ ধরে অপেক্ষা করতে থাকে এবং কয়েদির পোশাক পরা রফিক হাসিমুখে উপস্থিত হয়। পায়ে লোহার বালা। সেই বালা থেকে ঝন ঝন শব্দ হয়। একটা বালা থেকে এমন শব্দ হয় কেন ঝুমুর জানে না। ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে। প্রশ্নটা হাস্যকর হবে ভেবে কখনো জিজ্ঞেস করা হয় না।

প্রতিবারই রফিককে অন্যরকম লাগে। শেষবার দেখা করতে গিয়ে ঝুমুর একটা ধাক্কা খেল–রফিকের মুখভর্তি দাড়ি। দেখে মনে হয় মাদ্রাসার বাচ্চা মওলানা। আজ গিয়ে কী দেখবে কে জানে। ঝুমুরের যেতে ইচ্ছা করছে না। তবু সে যাবে। সে না গেলে আপাকে একা একা যেতে হবে। বেচারি সবকিছু একা করবে তা কি হয়? মা কখনো যাবে না। দু’ বছরে একবারও যায় নি। মাসে একটা চিঠি লেখা যায়, সেই চিঠিও লিখবে না।

শাহেদা রান্নাঘরে থালাবাসন ধুচ্ছিলেন। ঝুমুর এসে তাঁর পাশে বসল। শাহেদা বললেন, কী হয়েছে?

ঝুমুর বলল, জ্বর জ্বর লাগছে মা।

শুয়ে থাক।

ঝুমুর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। তার ধারণা পৃথিবীর সব মা 'জ্বর জ্বর লাগছে' এই বাক্য শোনার পর সন্তানের কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখবে। শুধু তার মা শুকনো গলায় বলবো 'শুয়ে থাক'।

ভাইয়ার জন্যে কিছু রেঁধে টেঁধে দেবে?

কী রাঁধব?

পায়েস বা এই জাতীয় কিছু। সবাই খাবার টাবার নিয়ে যায়—আমরা শুধু যাই খালি হাতে।

তোদের কিছু নিতে ইচ্ছে হলে নিজেরা রেঁধে নিয়ে যা।

ঝুমুর আর কিছু বলল না। তবে সে উঠে গেল না, মা'র পাশে বসে রইল। ঘরে তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। আপা শুটিঙে গেছে। সে বাসায় ফিরবে না। এফডিসির গেট থেকে আপাকে তুলে নিতে হবে। জয়দেবপুর থেকে তাকে একা একা যেতে হবে এফডিসি, এটাও তার জন্যে বিরাট সমস্যা। তার সাহস একেবারেই নেই। স্কুল থেকে সে বাসায়ও একা একা আসতে পারে না। তার এক বান্ধবীর সঙ্গে আসে। সেই বান্ধবী তাকে তাদের বাসার গেট পর্যন্ত দিয়ে তারপর তার বাসায় যায়। আজ একা একা এফডিসি পর্যন্ত কী করে যাবে কে জানে। যাওয়া অবশ্য খুব সোজা। ফার্মগেটে বাস থেকে নেমে একটা রিকশা নিতে হবে। পাঁচ টাকা নেবে রিকশা ভাড়া। আপা কখনো রিকশা নেয় না। বাস থেকে

নেমে সে হেঁটে হেঁটে যায়। তার পক্ষে সম্ভব না। তাকে উপায় না থাকলেও পাঁচ টাকা খরচ করতে হবে।

মা।

হুঁ।

একা একা এফডিসির গেট পর্যন্ত যাব কীভাবে?

মিতু যেভাবে যায় তুইও সেইভাবে যাবি। তোর জন্যে চৌকিদার পাব কোথায়?

মবিন ভাইকে বলব আমাকে পৌঁছে দিতে?

না।

অসুবিধা তো কিছু নেই। উনার যদি কাজ না থাকে...

তোর যাবার দরকার নেই। তোর আপা একাই যাবে।

মবিন ভাইকে তুমি এত অপছন্দ কর কেন?

পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার না, শুধু শুধু বাইরের একটা মানুষকে বিরক্ত করবি কেন?

উনি বাইরের মানুষ না, দুদিন পর বিয়ে হচ্ছে আপার সঙ্গে।

যখন হবে তখন দেখা যাবে।

ঝুমুরকে রান্নাঘরে রেখে তিনি উঠে গেলেন। বালতিতে কাপড় ভেজানো আছে। কাপড় ধুবেন। ঝুমুর একা একা বসে রইল। তার এখন ইচ্ছা করছে কলঘরে মা'র পাশে গিয়ে বসতে। সে একা একা বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

হঠাৎ ঝুমুরের মনে হলো, তার যখন বিয়ে হবে তখন তার স্বামী বেচারা খুব ঝামেলায় পড়বে। সারাক্ষণ সে স্বামীর সঙ্গে থাকবে। কে জানে সে হয়তো অফিসেও চলে যাবে। স্বামী কাজ করছে–সে তার সামনের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। ঝুমুরের এইসব ভাবতে খুব লজ লাগছে আবার না ভেবেও পারছে না। ইদানীং সে এইসব ব্যাপার নিয়ে খুব ভাবে। সে যখন একা থাকে। শুধু যে তখন ভাবে তা না, যখন অনেকের সঙ্গে থাকে তখনো ভাবে। সবচে' বেশি ভাবে ক্লাসে। আপা অঙ্ক করাচ্ছেন। সবাই বোর্ড থেকে অঙ্ক টুকছে আর সে ভাবছে অন্য কিছু। সেই অন্য কিছু মানে খারাপ কিছু না, আবার খারাপও। যেমন– আপা যখন অঙ্ক করাচ্ছিলেন তখন সে ভাবছে... ভাবছে না, পরিষ্কার চোখের সামনে দেখছে লাল রঙের একটা গাড়ি স্কুলে ঢুকল। গাড়ি থেকে একজন নামল–তার পরনে ধবধবে সাদা প্যান্ট, গায়ে চকলেট রঙের হাওয়াই শার্ট। শার্টের রঙটা কটকট করে চোখে লাগছে। তাকে দেখেই সে বের হয়ে আসছে। অঙ্ক আপা কঠিন গলায় বললেন, এই ঝুমুর কোথায় যাচ্ছ?

সে লজ্জিত গলায় বলল, আমার হাসবেন্ড আমাকে নিতে এসেছে আপা।

ও আচ্ছা যাও। তুমি কিন্তু খুব ক্লাস মিস দিচ্ছ।

না গেলে ও খুব রাগ করবে।

আচ্ছা যাও। উনাকে বলবে স্ত্রীর পড়াশোনার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। শুধু সঙ্গে নিয়ে ঘুরলে হবে না।

জ্বি, আপা বলব। সে বের হয়ে হনহন করে গাড়ির দিকে এগুল। তারপর বিরক্ত গলায় বলল, আচ্ছা তোমাকে কতবার না বলেছি। চকলেট কালারের এই শার্টটা পরবে না। তারপরেও পরেছ?

হাতের কাছে পেয়েছি, পরে চলে এসেছি।

তুমি এই শার্ট গায়ে দিয়ে থাকলে আমি কোথাও যাব না।

তাহলে শার্ট খুলে ফেলি, শার্টের নিচে স্যান্ডো গেঞ্জি আছে। স্যান্ডো গেঞ্জি পরা থাকলে যাবে?

আবার ঠাট্টা করছ?

ঝুমুরের চোখে পানি এসে গেছে। সে সবার ঠাট্টা সহ্য করতে পারে, এই মানুষটার ঠাট্টা সহ্য করতে পারে না। ঝুমুরের চোখে পানি দেখে সে লজ্জিত ভঙ্গিতে এসে তার হাত ধরল। ঝুমুর ঝটিকা মেরে সেই হাত সরিয়ে দিয়ে কঠিন গলায় বলল, ছিঃ এইভাবে হাত ধরলে–ক্লাসের সব মেয়েরা তাকিয়ে আছে, আপারা দেখছে।

দেখুক। তুমি কাঁদবে কেন?

আমি এক শ বার কাঁদব।

আমিও এক শ বার হাত ধরব।

এইসব ভাবতে ঝুমুরের এত ভালো লাগে! যা ভাবা হয়। সত্যিকার জীবনে তা কখনো ঘটে না। ঝুমুরের নিশ্চিত ধারণা তার বিয়েই হবে না। আর হলেও পানের দোকানদার টাইপ কারো সঙ্গে হবে। যার গায়ে সবসময়ই ঘাম আর কড়া সিগারেটের গন্ধ থাকবে।

দুপুরে ঝুমুর কিছু খেতে পারল না। তাকে একা একা ঢাকা যেতে হবে এই টেনশানেই তার মুখে কিছু ভালো লাগছে না। কেমন যেন গা গুলাচ্ছে। ঝুমুর বলল, মা তুমি আমাকে বাসে তুলে দিয়ে আস।

শাহেদা শান্ত গলায় বললেন, কোথাও তুলে দিতে পারব না। তুই নিজে নিজে বাস খুঁজে বের করবি। নিজে নিজে উঠবি।

আচ্ছা। ভাইয়াকে কিছু বলতে হবে?

না।

আপাকে কিছু বলতে হবে?

ঘরে চা নাই, চিনি নাই।

চা চিনি ছাড়া আর সব আছে?

শাহেদা জবাব দিলেন না।

আমি কি এই কামিজটা পরেই যাব?

তোর যা ইচ্ছা পর।

কামিজটা যা নোংরা হয়ে আছে। আপার একটা শাড়ি পরে ফেলব মা?

শাহেদা জবাব দিলেন না। কথাবার্তা তিনি এমনিতেই কম বলেন–যত দিন যাচ্ছে কথাবার্তা আরো কমিয়ে দিচ্ছেন।

ঝুমুর ঘর থেকে বের হয়ে অসীম সাহসী এক কাণ্ড করল। মবিনের মেসে যাবার জন্যে একটা রিকশা ঠিক করে ফেলল। কাজটা অসীম সাহসিক এই কারণে যে মবিনকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে সে ঘোরতর সমস্যায় পড়বে। টাকায় টান পড়ে যাবে। ফার্মগেট থেকে নেমে এফডিসি যেতে হবে হেঁটে হেঁটে। সে চিনে যেতে পারবে কিনা তাও এক সমস্যা। বাইরে একা বেরোলেই তার শুধু সমস্যা হয়। হয়তো স্যান্ডেলের স্ট্যাপ ছিঁড়ে যাবে। তাকে যেতে হবে স্যান্ডেল হাতে নিয়ে। তারচে' বড়ো সমস্যাও হতে পারেহয়তো ইতিমধ্যে মবিন ভাই তার ঘর বদলেছেন। সে দরজির দোকানের সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজায় নক করল। দরজা খুলল–দেখা গেল ভয়ঙ্কর দর্শন কয়েকজন চৌকিতে বসে তাস খেলছে।

সবার সামনে মদের গ্লাস। ঝুমুর কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, মবিন ভাই কি এখানে থাকেন না? একজন চাপা গলায় উত্তর দিল, জ্বি না খুকুমণি, উনি থাকেন না। তাতে কী হয়েছে আমরা তো থাকি?

সেই লোকটা তারপর মাথা ঘুরিয়ে কোণায় বসে থাকা এক লোককে বলল–ঐ যা তো মেয়েটাকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দে। মুখে রুমাল ওঁজে দে। নয়তো চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলবে।

ঝুমুর দরজার কড়া নাড়ল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। মবিন বলল, ঝুমুর তুমি, ব্যাপার কি?

আমি ঢাকা যাব মবিন ভাই।

ঢাকা যাবে অতি উত্তম কথা। এটা তো ঢাকা যাবার দোতলা বাস না যে তুমি দোতলায় উঠে এলে।

আপনি আমাকে ঢাকার বাসে তুলে দেবেন।

অতি উত্তম তুলে দেয়া হবে।

শুধু তুলে দিলে হবে না। আপনাকে আমার সঙ্গে এফডিসির গেট পর্যন্ত যেতে হবে।

ব্যাপার কী?

আজ ভাইয়ার সঙ্গে দেখা করার ডেট। আপা আমাকে বলেছে আড়াইটার সময় এফডিসির গেটে থাকতে। একা একা আমি কোথাও যাই না। তবু ...

কোনো সমস্যা নেই, তোমাকে একা একা যেতে হবে না।

আপনি কিন্তু আমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে যাবেন এবং আপনি যে আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেছেন সেটা আপাকে বলবেন না।

এত গোপনীয়তা কেন?

আপাকে বললেই আপার কাছ থেকে মা জানবে। মা খুব রাগ করবে। এই ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই শ্রেয়। আড়াইটার সময় পৌঁছতে হবে?

হুঁ।

তাহলে বোস কিছুক্ষণ, আমি ভাত খেয়ে নি।

আচ্ছা।

তুমি খেয়ে এসেছ?

হুঁ।

আমার সঙ্গে চারটা খাবে?

খেতে পারি। আমি কি আপনার বিছানায় পা তুলে বসব মবিন ভাই?

অবশ্যই বসবে।

আপনার ঘরে ঢুকলেই কেমন শান্তি শান্তি ভাব হয়। কেন বলুন তো মবিন ভাই?

ঘরটা ফাঁকা তো–কোনো আসবাব নেই–একটা চৌকি, একটা চেয়ার। চৌকিতে শীতলপাটি বিছানো। শীতলপাটি মানেই শান্তি, ফাঁকা ঘর মানেই শান্তি। এই জন্যে আমার ঘরে পা দিলেই শান্তি শান্তি ভাব হয়।

আপনি কি আপার সঙ্গেও এরকম করে কথা বলেন, না আপার সঙ্গে অন্যরকম করে কথা বলেন?

এরকম করেই কথা বলি।

সে কি আপনার কথা শুনে খুশি হয়?

জিজ্ঞেস করি নি কখনো।

জিজ্ঞেস করতে হবে! মুখ দেখেই তো বোঝা যায়।

আমি তোমার আপার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারি না।

আমিও পারি না।

মবিন খবরের কাগজ বিছাচ্ছে। টিফিন কেরিয়ারের বাটি বের করছে। ঝুমুর বলল, আমাকে কি আজ একটু অন্যরকম লাগছে না?

হুঁ লাগছে।

কেন অন্যরকম লাগছে বলুন তো?

শাড়ি পরেছ এই জন্যেই অন্যরকম লাগছে।

ও আপনি তাহলে লক্ষ করেছেন। আমি ভাবলাম বোধহয় লক্ষ করেন নি।

লক্ষ করব না কেন, করেছি।

যারা দিনরাত বই পড়ে তারা বই ছাড়া আর কিছুই লক্ষ করে না।

আমি করি।

ঝুমুর বাসায় কিছু খেতে পারে নি। এখানে একগাদা ভাত খেয়ে ফেলল। হাসিমুখে বলল, মবিন ভাই, ঘুমে এখন আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। আপনার শীতলপাটিতে ঘুমুতে নিশ্চয় খুব আরাম।

আমার তো আরামই লাগে।

আমি একদিন স্কুল ফাঁকি দিয়ে আপনার শীতলপাটিতে এসে আরাম করে ঘুমুব।

বাসায় আরাম করে ঘুমুতে পার না?

না, এতটুকু একটা বিছানা, আপা আর আমি দু'জন ঘুমাই। খুব চাপাচাপি হয়। মা'র বিছানাটা বড় কিন্তু মা'র সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছা করে না। মা'র রাতে ঘুম হয় না তো–সারারাত এপাশি-ওপাশ করে। মাঝে মাঝে কাঁদে। তার গায়ের সঙ্গে গা লাগলে কী করে জানেন? ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

ঝুমুর চল, ওঠা যাক। এখন রওনা না হলে আড়াইটার সময় পৌঁছাতে পারবে না।

ঝুমুর অনিচ্ছার সঙ্গে উঠল। মবিন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে তার সব সময়ই ভালো লাগে। আজ অন্য দিনের চেয়েও ভালো লাগছে।

মবিন ভাই!

হুঁ।

আপনাদের বিয়ে কবে হবে?

বুঝতে পারছি না। চাকরি বাকরি ছাড়া বিয়ে করা ঠিক হবে না।

চাকরির আশায় বসে থাকলে আপনার আর বিয়ে হবে না।

তোমার ধারণা আমার চাকরি বাকরি হবে না?

হুঁ।

ভুল ধারণা। আমি বিরাট একটা চাকরি পাব। চা বাগানের ম্যানেজার। বাংলো টাইপ একটা বাড়ি থাকবে, মালী থাকবে, সুইপার থাকবে। চা বাগানে ঘোরার জন্যে ল্যান্ড রোভার জিপ থাকবে। বিকেলে আমাদের অফিসার্স ক্লাবে গিয়ে হাফপ্যান্ট আর টি শার্ট পরে লং টেনিস খেলিব। জোছনা রাতে বাংলোর বারান্দায় আমি আর তোমার আপা রকিং চেয়ারে বসে চুকচুক করে শেরী খাব এবং জোছনা দেখব।

শেরীটা কী? মদ?

মদ বলবে না। মদ বললে মনে হয় ধেনো মদ। শেরী হলো মিষ্টি মিষ্টি এক ধরনের পানীয় যার অল্প খানিকটা পেটে গেলে জোছনা অনেক সুন্দর মনে হয়। বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে।

শেরী যারা খায় না তাদের বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না?

বেঁচে থাকার মধ্যে পার্থক্য আছে। সব বেঁচে থাকা একরকম না।

ঝুমুর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এইসব চাকরি আপনাকে মানবে না মবিন ভাই। আপনি যা আছেন, তাই আপনাকে মানাচ্ছে। ছোট্ট সুন্দর একটা ঘর। পাটি বিছানো চৌকি ...বাহ্ ।

মবিন হো-হো করে হেসে ফেলল। ঝুমুর অপ্রস্তুত হয়ে বলল, হাসলেন কেন?

আছে একটা কারণ। তোমাকে বলা যাবে না।

আচ্ছা ঠিক আছে বলতে না চাইলে বলবেন না–শুধু একটা সত্যি কথাই বলুন। আমাকে খুশি করার জন্যে মিথ্যা বলতে পারবেন না।

আচ্ছা যাও সত্যি কথাই বলব।

শাড়ি পরায় আমাকে কি খুব সুন্দর লাগছে?

যে সুন্দর সে যাই পারুক তাকে সুন্দর লাগবে।

আমি কি সুন্দর মবিন ভাই?

অবশ্যই সুন্দর।

আপা বেশি সুন্দর, না। আমি? সত্যি কথা বলতে হবে কিন্তু।

দু'জনের সৌন্দর্য দু'রকম। কোনো দু'জন রূপবতী মেয়ের ভেতর তুলনা চলে না। একেক জনের সৌন্দর্য একেক রকম। কেউ নদীর মতো, কেউ অরণ্যের মতো, আবার কেউ আকাশের মতো!

আমি কীসের মতো?

ঝরনার মতো।

আর আপা?

সে অরণ্যের মতো।

অরণ্য বেশি সুন্দর না ঝরনা?

কারো কারো কাছে অরণ্য সুন্দর, কারো কাছে ঝরনা।

ঝুমুর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনার কাছে অরণ্য সুন্দর তাই না? এই জন্যেই চা বাগানের চাকরি আপনার এত পছন্দ, ঠিক না?

মবিন জবাব দিল না। সে একটু অস্বস্তির সঙ্গে শাড়ি পরা মেয়েটির দিকে তাকাল।

ঝুমুর ঠিক আড়াইটার সময় এফডিসির গেটে এসেছে। তখন থেকেই সে অপেক্ষা করছে। আপার বেরুবার নাম নেই। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা খুব অস্বস্তিকর। একগাদা লোক দাঁড়িয়ে আছে। কোনো একটা গাড়ি এফডিসির ভেতরে ঢুকলেই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। নায়ক-নায়িকা কাউকে এক ঝলক দেখা যায় কিনা।

কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নায়ক-নায়িকারা আসছে পর্দা ঢাকা গাড়িতে। অনেকের গাড়ির কাচ টিনটেড। বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। একগাদা মানুষের ভেতর ঝুমুর একাই মেয়ে। সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। একজন এসে জিজ্ঞেস করল সে এফডিসির ভেতর ঢুকতে চায় কিনা। ঝুমুর ভীত গলায় বলল, না।

ভিতরে যাইতে চাইলে সমস্যা নাই–নিয়া যাব।

জ্বি না, আমি যাব না।

লোকটা তবু তাকে ছাড়ছে না। তার আশপাশেই আছে। ভদ্রলোকের মতো চেহারা কিন্তু মতলববাজ তা বোঝাই যাচ্ছে–নয়তো ঝুমুরকে এফডিসির ভেতর নিয়ে যাবার ব্যাপারে তার এত আগ্রহ হবে কেন? সময় কতক্ষণ গেছে ঝুমুর বুঝতে পারছে না। তার সঙ্গে ঘড়ি নেই। লোকটাকে অবশ্যি জিজ্ঞেস করা যায়। তার হাতে বাহারি ঘড়ি।

আচ্ছা আপা কোনো কারণে বাসায় চলে যায় নি তো? যদি চলে গিয়ে থাকে তাহলে তো সে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়বে। একা একা ফিরতে হবে জয়দেবপুর। এই বদলোক নিশ্চয়ই তার পেছনে পেছনে যাবে।

ঝুমুর।

ঝুমুর চমকে তাকাল। মিতু বের হয়েছে। তার মুখে মেকআপ। ঠোঁট টকটকে লাল। তাড়াতাড়ি আসার জন্যে মেকআপ তোলারও সময় পায় নি।

তুই কি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছিস?

হুঁ। তোমার শাড়ি পরে চলে এসেছি। রাগ কর নি তো?

না, শুধু শুধু রাগ করব কেন? চল যাই–আয় একটা রিকশা নিয়ে নিই। একা একা আসতে ভয় লাগে নি তো?

উঁহুঁ।

বাহ্। তোর তো সাহস বেড়েছে। কিছুক্ষণ হাঁটতে পারবি ঝুমুর?

হুঁ পারব।

তাহলে আয় একটু হাঁটি–বাংলামোটর পর্যন্ত গেলে টেম্পো পাওয়া যাবে।

তুমি ঢাকা শহরে সব রাস্তাঘাট চেন তাই না?

মোটামুটি চিনি।

আপা, বাসায় চিনি নাই, চা নাই।

মিতু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। সেই নিঃশ্বাস ফেলা দেখে ঝুমুর নিশ্চিত বুঝল আপার কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই।

তোর কি হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ঝুমুর?

উঁহুঁ।

হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্যেও ভালো।

তুমি তো আর স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্যে হাঁটছ না, দায়ে পড়ে হাঁটছ। গাড়ি থাকলে তুমি কি আর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে হাঁটতে?

তাও ঠিক।

আপা, আজ খুব ভোরবেলা বাড়িওয়ালা এসেছিল দু'টা পেঁপে নিয়ে। তার বাগানের পেঁপে। মা'র সঙ্গে কথা বলল।

বাড়ি ছেড়ে দিতে বলল?

হুঁ।

বেশি ভাড়ার ভাড়াটের কাছে ভাড়া দেবে?

তা বলল না। তার নিজের জন্যেই বাড়ি দরকার। সংসার বড় হয়েছে, ছোট ছেলে হুট করে বিয়ে করে ফেলেছে–এইসব কথা।

মা কী বলল?

মা কিছুই বলে নি, শুধু শুনেছে।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ঝুমুর?

না।

এই তো এসে পড়েছি।

আমরা কি সত্যি সত্যি-টেম্পোতে করে একদল পুরুষের সঙ্গে গা ঘেসাঘেঁসি করে যাব? আমার তো ভাবতেই বমি আসছে।

তোকে এক কোণায় বসিয়ে দেব। তোর আর কারো সঙ্গে গা ঘেঁসে যেতে হবে না।

তোমার তো যেতে হবে।

আমার এইসব গা সহা হয়ে গেছে।

আমাদের মতো খারাপ অবস্থায় বোধহয় কেউ নেই, তাই না আপা?

থাকবে না কেন, আমাদের চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থায় লোক আছে। আমার পরিচিত এক মেয়ে আছে–ওর নাম টেপী। ছবিতে ছোটখাটো রোল করে। বিরাট সংসার তাকে একা টানতে হয়। ছবির পয়সায় তো হয় না–কিছু জঘন্য কাজ তাকে করতে হয়।

জঘন্য কাজটা কী?

মিতু জবাব দিল না। টেম্পোস্ট্যান্ড চলে এসেছে। সে বোনের হাত ধরে খালি টেম্পো খুঁজছে। সবার আগে উঠলে ঝুমুরকে কোণার দিকে নিরাপদ জায়গায় বসাতে পারবে।

রফিক দু'বোনকে দেখে হাসল। গতবার তার মুখভর্তি দাড়ি ছিল। এখন নেই। মাথার চুলও ছোট ছোট করে কাটা। তার গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। লম্বা হালকাপাতলা শরীর। জেলের বাইরে সাধারণ কোনো পোশাক পরিয়ে দিলেও তাকে দেখে সবাই বলবে, বাহ্ ছেলেটা সুন্দর তো! আজি তাকে মোটেই সুন্দর লাগছে না। তার চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। ঠোঁট ফ্যাকাসে। ঠোঁটের দু কোণায় ঘায়ের মতো হয়েছে। ঝুমুর কাঁপা গলায় বলল, কেমন আছ ভাইয়া?

রফিক মাথা নাড়ল। কিছু বলল না। তার স্বভাবও শাহেদার মতো। সেও কথা কম বলে।

ভাইয়া, তোমার কি শরীর খারাপ?

একটু খারাপ।

কী হয়েছে?

রাতে ঘুম হয় না।

মিতু বলল, তোমাদের জেলে ডাক্তার নেই?

আছে–ডাক্তার, হাসপাতাল সবই আছে।

ঘুম হচ্ছে না, সেটা তাহলে ডাক্তারকে বল। কতদিন ধরে ঘুম হচ্ছে না?

রফিক প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে বলল, মা'র শরীর কেমন?

ভালো।

আমাকে দেখার জন্যে আসতে চায় না?

না।

এমনিতে শরীর ভালো?

হুঁ।

তোরা চলে যা, আর কী, দেখা তো হলো।

মিতু বলল, ভাইয়া তোমার শরীর কিন্তু খুবই খারাপ করেছে। তুমি ডাক্তারকে তোমার অসুখের কথা বল।

বলব।

ভাইয়া। তোমার জন্যে দুশ টাকা এনেছি। জেল গেটের জমাদার মোসাদেক আলীর কাছে দিয়েছি। তোমার কাছে পৌঁছবে তো?

অর্ধেক পৌঁছবে।

আর তোমার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট এনেছি।

সঙ্গে ম্যাচ আছে?

হ্যাঁ।

দে তাহলে একটা খাই।

রফিক সিগারেট ধরাল। নীরবে টানছে। ঝুমুর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা করছে। বলতে পারছে না। সে কোনোমতে বলল, জেলখানায় থাকতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না ভাইয়া?

রফিক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, না, কষ্ট আর কী? মানুষ খুন করে জেলে আছি–ঠিকই তো আছে। অনেকে কোনো অপরাধ না করে খুনের দায়ে

যাবজীবন জেল খাটছে। কষ্ট তাদের। তোরা চলে যা। মা'কে একবার ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসিস। উনার বয়স হয়েছে, হুট করে কোনোদিন মরে যাবেন, আর দেখা হবে না।

মিতু বলল, পরের বার যখন আসি নিয়ে আসব। ভাইয়া আমরা এখন যাই?

আচ্ছা যা। ঝুমুর ছয় মাসে এত বড় হয়ে গেল কীভাবে?

ঝুমুর লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, আমি বেশি বড় হইনি ভাইয়া। শাড়ি পরেছি। এই জন্যে বড় লাগছে।

মা যদি আমার কথা জানতে চায় তাহলে বলিস। আমি ভালোই আছি। রাতে ঘুম হচ্ছে না। এইসব বলার দরকার নেই।

ফেরার পথে তারা মোটামুটি ফাঁকা বাস পেয়ে গেল। ঝুমুর জানালার পাশে বসেছে। একটু পর পর চোখ মুছছে। ভাইয়াকে দেখে ফেরার পথে সব সময় সে এরকম কাঁদে। প্রতিবারই ভাবে সে মা'র মতো হয়ে যাবে–কখনো দেখতে যাবে না। কখনো না।

আজমল তরফদার

আজমল তরফদার মোবারক হোসেনের চেক ক্ষীণ সন্দেহ নিয়ে ব্যাংকে জমা দিয়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল। চেক ক্যাশ হবে না। বড়লোকদের নানান খেয়াল হঠাৎ মাথায় চাপে আবার হঠাৎই মিলিয়ে যায়। হঠাৎ উদয় হওয়া শখ হঠাৎ মেটাই স্বাভাবিক। চেক দেবার পর পরই হয়তো উনার শখ মিটে গেছে। উনি ব্যাংকে টেলিফোন করে বলে দিয়েছেন এত নাম্বারের চেক ক্যাশ করবেন না।

বড় চেকের সঙ্গে চিঠি দিতে হয়। ব্যাংক ম্যানেজার চিঠি না পেলে চেক ক্যাশ করেন না। অনেকে আবার আরেক কাঠি সরাস–কারেন্ট অ্যাকাউন্টে চেক না কেটে সেভিংস অ্যাকাউন্টে কাটে। আজমল তরফদার এইসব জটিলতার সঙ্গে পরিচিত। পরিচিত বলেই খানিকটা হলেও সন্দেহ নিয়ে তিনি ছিলেন। তিন দিনের ভেতরে চেক ক্যাশ হবার কথা, তারপরেও তিনি সাত দিন সময় দিলেন। সাত দিন পর ব্যাংকে টেলিফোন করে জানলেন চেক ক্যাশ হয়েছে।

তিনি তার পর পরই মোবারক সাহেবকে টেলিফোন করলেন। ছবি নিয়ে কথাবার্তা বলা দরকার। সামান্য বিয়ের মতো ব্যাপারে এক লাখ কথা খরচ হয়–আর এ হলো ছবি। কুড়িটা বিয়ে একসঙ্গে হবার মতো যন্ত্রণা–এখানে কথা বলতে হবে খুব কম করে হলেও কুড়ি লাখ।

টেলিফোন ধরলেন মোবারক সাহেবের পিএ। তিনি জানালেন, স্যার ব্যস্ত আছেন। কথা বলবেন না।

আজমল তরফদার বললেন, আপনি কি আমার নাম বলেছেন? বলেছেন যে ফিল্ম ডাইরেক্টর আজমল তরফদার। আমি স্যারের জন্যে ছবি বানাচ্ছি।

জ্বি আপনার নাম এবং পরিচয় বলা হয়েছে।

আমি কি পরে টেলিফোন করব?

করতে পারেন, তবে স্যার কথা বলবেন বলে মনে হয় না।

আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। এরকম মনে হবার কারণ কী?

কারণ সার বলেছেন ছবি নিয়ে যা কথা বলার তা বলা হয়েছে, নতুন কিছু বলার নেই।

আমার টেলিফোন নাম্বারটা রাখুন। যদি স্যার কথা বলতে চান।

দিন, টেলিফোন নাম্বার দিন।

আজমল তরফদার টেলিফোন নাম্বার দিয়েছেন। কেউ সে নাম্বারে টেলিফোন করে নি। ছবি তৈরি কোনো সহজ ব্যাপার তো না। স্ক্রিপ্ট রাইটারকে দিয়ে স্ক্রিপ্ট লেখাতে হবে, তাকে টাকা দিতে হবে; আর্টিস্ট ঠিক করতে হবে, তাদের শিডিউল নিতে হবে; এফডিসিতে চার লাখ টাকার মতো জমা দিতে হবে–এই কাজগুলো করবে কে? আজমল তরফদার আবার টেলিফোন করলেন। পিএ ধরল।

আমি ফিল্ম ডাইরেক্টর আজমল তরফদার...

কথা শেষ করার আগেই পিএ বলল, স্যার ব্যস্ত আছেন, কথা বলতে পারবেন না।

আজমল তরফদার বিরক্ত গলায় বললেন, কথা তো আমাকে বলতেই হবে, গল্প লাগবে, চিত্রনাট্য লাগবে, গান লাগবে –এর প্রতিটির জন্যে...

আমি যতদূর জানি এইসব দায়িত্ব আপনাকেই পালন করতে বলা হয়েছে।

ভাইসাহেব, দায়িত্ব তো পালন করব কিন্তু এর প্রতিটির জন্যে টাকা লাগবে। টাকা দেবে কে?

টাকা স্যারের অফিস দেবে, স্যার তো দেবেন না। আপনি অফিসে চলে আসুন। কোন খাতে কত দরকার বলুন। ভাউচারে সই করে টাকা নিয়ে যান।

কখন আসব?

অফিস টাইমে আসবেন।

অফিস টাইম কখন?

দশটা থেকে চারটা।

এখন বাজছে তিনটা, এখন আসতে পারি?

অবশ্যই পারেন।

আজমল তরফদার তৎক্ষণাৎ অফিসে চলে গেলেন। তার ধারণা ছিল তিনি নিতান্তই বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়বেন। এই টেবিল থেকে ঐ টেবিলে যেতে হবে। ম্যানেজার টাইপের একজন শেষ পর্যায়ে শুকনো মুখে বলবে, আপনার কী ডিমান্ড একটা কাগজে লিখে দিয়ে যান আমরা ইনকোয়ারি করি–সপ্তাহখানেক পরে এসে খোঁজ নেবেন।

বাস্তবে তিনি সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার দেখলেন। ছবির কাগজপত্র এবং টাকা-পয়সার ব্যাপারে দেখাশোনার জন্যে আলাদা একজন লোক রাখা হয়েছে। তার নাম বিমলচন্দ্র হাওলাদার। বাচ্চা ছেলে কিন্তু মনে হচ্ছে কাজকর্মে খুব সেয়ানা।

আজমল তরফদার ঘরে ঢুকতেই সে তাকে অত্যন্ত যত্ন করে বসাল। কফি খাবেন না চা খাবেন জানার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বিমল হাসিমুখে বলল, ছবির কাজ কি সত্বর শুরু হচ্ছে?

হ্যাঁ হবে। তবে ছবি তো আর স্পিঙের খেলনা না যে চাবি দিলেই চলবে। গল্প, চিত্রনাট্য– এইগুলো লেখাতে হবে না?

স্যার অবশ্যই হবে।

এর জন্যে টাকা লাগবে না?

চেক বই তো স্যার আমার কাছে। আপনি বলবেন, আমি চেক লিখব। আপনি যেদিন বলবেন আপনার সঙ্গে যাব–আর্টিস্টদের বাসায় চেক পৌছে দেব। স্যার, এখন বলুন কী খাবেন? কফি দিতে বলি?

বলুন।

আমাকে তুমি করে বলুন স্যার।

এফডিসিতে টাকা জমা দিতে হবে। পি টাইপ ছবির জন্যে সাড়ে চার লাখ টাকা জমা দিতে হয়।

ঐ টাকাটা স্যার জমা দেয়া হয়েছে।

বল কী?

শুটিং শিডিউলও স্যার নেয়া আছে।

আজমল তরফদার বিস্মিত হলেন। বিমলচন্দ্র তাঁর দিকে ঝুকে এসে বলল, স্যার, আমাদের অফিস হলো দশটা-চারটা কিন্তু আপনার জন্যে আমি সারাক্ষণই থাকব। যখন বলবেন তখন আপনার বাসায় উপস্থিত হব।

বাসার ঠিকানা জান?

জানি। ফাইলে আছে।

কফি চলে এসেছে। কফির পেয়ালা হাতে নিতে নিতে আজমল তরফদার বললেন, কিছু মনে করবে না বিমল, ছবির ফান্ড কি আলাদা করা, নাকি মেইন ফান্ড থেকে খরচ হচ্ছে?

স্যার, ছবির জন্যে আলাদা ফান্ড দেয়া হয়েছে।

মোট কত টাকা আছে সেই ফান্ডে? বলতে যদি কোনো বাধা না থাকে।

বলতে কোনো বাধা নেই স্যার। মোট দেড় কোটি টাকা আলাদা করা হয়েছে। সেখান থেকে খরচ হয়েছে চার লাখ টাকা। ডাইরেক্টর হিসেবে আপনাকে টাকা দেয়া হয়েছে।

আজমল তরফদার বললেন, ছবির লাইনে তোমার কি কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে?

বিমল হাসিমুখে বলল, স্যার, ছবির লাইনে কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু আপনি আমার উপর ভরসা করতে পারেন। আমি খুব দ্রুত কাজ শিখতে পারি। বড় সাহেব এই কারণে আমাকে খুব পছন্দ করেন। তিনি যে-কোনো নতুন প্রজেক্ট আমাকে দিয়ে শুরু করেন।

ও আচ্ছা।

স্ক্রিপ্ট লেখার টাকাটা আজ স্যার আপনি নিয়ে যান। কত দেব?

এক লাখ টাকা দাও।

একটা কথা বলব স্যার?

বল।

পুরো টাকাটা একসঙ্গে দিলে কাজ আদায় হবে না। আমরা যদি শুরুতে দশ হাজার টাকা দেই এবং বলি যেদিন স্ক্রিপ্ট শেষ হবে সেদিনই পুরো টাকা একসঙ্গে দেয়া হবে তাহলে বোধহয় ভালো হবে।

কথাটা মন্দ বল নি।

আরেকটা কাজ স্যার করা যেতে পারে। আমরা বলতে পারি–স্ক্রিপ্ট যদি খুব ভালো হয় এবং স্যারের যদি খুব পছন্দ হয় তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা বোনাস।

ক্রিপ্টের জন্যে কত টাকা ধরা আছে?

স্ক্রিপ্টের জন্যে দশ লাখ টাকা ধরা আছে।

এত টাকা?

স্ক্রিপ্ট তো স্যার একটা হবে না, বেশ কয়েকটা হবে। এর মধ্যে আমরা একটা বেছে নেব।

কে বাছবে?

আপনি বাছবেন।

আবার কে? স্যার, আরেক কাপ কফি দেই?

দাও।

আপনার কি কোনো ট্রান্সপোর্ট আছে স্যার?

জ্বি না।

অফিস থেকে আপনি একটি গাড়ি রিকুইজিশন নিয়ে নিন। যতদিন কাজ করবেন। ততদিন গাড়ি চব্বিশ ঘণ্টা আপনার সঙ্গে থাকবে।

ড্রাইভারসহ?

অবশ্যই ড্রাইভারসহ। আমি বলি কি স্যার আপনি বড়ো একটা গাড়ি নিন–মাইক্রোবাস বা পিক-আপ, এতে আপনার কাজের সুবিধা হবে।

বিমল, তোমার এখানে কি সিগারেট খাওয়া যায়?

জ্বি স্যার, খাওয়া যায়।

আরেকটা কথা–মোবারক সাহেব নামের লোকটির কত টাকা আছে তুমি জান?

আমার কোনো ধারণা নেই স্যার।

কোনো আন্দাজ আছে?

আমি স্যার ছোট মানুষ, ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আন্দাজ করি। বড় বিষয় নিয়ে আন্দাজ করে সময় নষ্ট করি না। স্যার, কী ধরনের গাড়ি নেবেন তা তো বললেন না?

দাঁড়াও একটা সিগারেট খেয়ে নিই। বিমল তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে।

বিমল হাসতে হাসতে বলল, আমাকে আপনার আরো পছন্দ হবে। যত দিন যাবে। ততই আপনি আমাকে পছন্দ করবেন।

কেন বল তো?

স্যার, আমি যে-কোনো কাজ খুব সুন্দর করে করতে পারি।

আমার তো মনে হচ্ছে তুমি অহঙ্কারী।

কিছু অহঙ্কার তো স্যার থাকবেই। রাস্তার যে ভিখিরিটি অন্যদের চেয়ে বেশি ভিক্ষা পায় সেও অহঙ্কার করে, আমি কেন করব না?

স্যার কি আরেক কাপ কফি খাবেন? আগেরটা খান নি এই জন্যে বলছি।

দাও খাই আরেক কাপ।

আপনার বোধহয় সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। সিগারেট আনিয়ে দেব?

দাও।

আজমল তরফদারের জন্যে নতুন করে কফি আনতে গিয়েছে, কিন্তু তিনি মনের ভুলে ঠাণ্ডা, সরপড়া কফিতেই চুমুক দিয়ে ফেলেন।

বিমল।

জ্বি স্যার?

তোমাদের এই বড় সাহেবের, আই মিন মোবারক সাহেবের ছবি বানানোর শখের পেছনের কারণটা কী?

ব্যবসা। ছবির ব্যবসা তো ভালো ব্যবসা। বাংলাদেশে পাঁচ শ'র মতো সিনেমা হল-প্রতি হল থেকে গড়পড়তা দশ হাজার টাকা পেলেও প্রথম রানে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা উঠে আসে। তাছাড়া আমি যতদূর জানি উনি সিনেমা হলও বানাবেন।

সিনেমা হল বানাবেন?

জায়গা নেয়া হয়েছে, আর্কিটেক্টকে ডিজাইন করতে বলা হয়েছে।

বল কী?

স্যার, উনি খুব গোছানো মানুষ।

তাই তো দেখছি। আমার ধারণা ছিল ছবি তৈরির ব্যাপারটা হুট করে মাথায় এসেছে।

নতুন কফি এসেছে। পিরিচে বেনসন এন্ড হেজেস-এর প্যাকেট এবং দেশলাই। আজমল তরফদার বললেন, বিমল তুমি সিগারেট খাও?

জ্বি স্যার, খাই।

নাও সিগারেট নাও।

আপনার সামনে খাব না স্যার।

খাও খাও, ফিল্ম লাইনে সব সমান।

বিমল সিগারেট ধরাল না। আজমল তরফদাব সিগারেট ধরিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে কফিতে চুমুক দিলেন। বিমল বলল, স্যার যারা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে তারা শুধু যে ভাগ্যের জোরে সেটা করে তা কিন্তু না। ভাগ্য থাকে তাদের হাতের মুঠোয়, ভাগ্য নিয়ে তারা খেলা করে। পৃথিবীতে যারা বিলিওনিয়ার আছে তারা কোনো কারণ ছাড়াই বিলিওনিয়ার হয় নি।

তুমি কী বলতে চোচ্ছ বুঝতে পারছি না।

আমি বলতে চাচ্ছি—বড় সাহেব হুট করে কোনোদিনই কিছু করেন না। তিনি যখন ছবির জগতে এসেছেন তখন ধরে নিতে হবে এই জগৎ তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন।

আজমল তরফদার উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আমি বিলিয়নিয়ার না, সামান্য ফিল্ম মেকার–আইএ পাস বিদ্যা। আমি তোমাকে একটা কথা বলছি, শুনে রাখ। ছবি বানানোর এই ঝোঁক তোমার বড় সাহেবের হঠাৎ করেই হয়েছে। আমাদের ছবি পাড়ার একটা মেয়ে–আজেবাজে টাইপের মেয়ের জন্যে এটা তার গিফট। তবে ঝানু ব্যবসায়ীরা গিফট থেকেও লাভ করে। যে কারণে এত আটঘাট বেঁধে ছবিতে নামা হচ্ছে। রেশমা নামের বলতে গেলে পথের-কুকুরি সুপারস্টার হিসেবে বের হয়ে আসবে। সে তার পুরস্কার পেয়ে গেল। একই সঙ্গে ছবির বাণিজ্যও হলো।

বিমল চুপ করে আছে। কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। আজমল তরফদার বললেন, বিমল তোমাকে আমার মনে ধরেছে বলে আমি এই কথাগুলো বললাম।

বিমল বলল, স্যার আপনাকেও আমার মনে ধরেছে। ছবি বানানোর ব্যাপারে আমাদের টিমওয়ার্ক খুব কাজে আসবে। আপনি গাড়ি রিকুইজিশন না করেই উঠে যাচ্ছেন। কী গাড়ি নেবেন তা তো বলেন নি। আরেকটু বসুন–কাজটা শেষ করি। আপনি কিন্তু দ্বিতীয়বারের কফিটাও খান নি–ঠাণ্ডা করে ফেলেছেন।

বাড়িওয়ালা চাচা নিজামউদ্দীন

ঝুমুর দরজা খুলে দেখে বাড়িওয়ালা চাচা নিজামউদ্দীন। আজো তার হাতে দু'টো পাকা পেঁপে। তার আগের বার দিয়ে যাওয়া পেঁপে দু'টোর একটা এখনো পড়ে আছে। ফেলে দেয়াই উচিত। মিষ্টি-টিষ্টি কিচ্ছু নেই–তিতকুট স্বাদ। এত বড় একটা পাকা পেঁপে ফেলতে মায়া লাগে বলে ফেলা হয় নি।

নিজামউদ্দীন হাসিমুখে বললেন, কেমন আছ গো মা?

ঝুমুর বলল, ভালো।

আপা আছে?

জ্বি না।

ফিরবে না?

আজ রাতে ফিরবে না।

ছবির শুটিং কি সারারাত ধরেই চলে?

সব সময় চলে না, মাঝে মাঝে চলে–যখন ছবির কাজ দ্রুত শেষ করতে হয় তখন সারারাত কাজ করতে হয়।

হতে পারে। ছবির লাইনের কাজকারবার তো জানি না। তোমার আপার সঙ্গে দরকার ছিল। যাই হোক মা আছে না?

আছে। উনার শরীর ভালো না–শুয়ে আছে।

আমার কথা একটু গিয়ে বল। দু'টা কথা বলে চলে যাব। নাও পেঁপে দু'টা নিয়ে যাও।

আপনি বসুন।

নিজামউদ্দীন বসতে বসতে বললেন, ঘরে পান থাকলে আমাকে একটু পান দিও তো মা। রাতে ভাত খেয়েই বের হয়েছি।–মুখ মিষ্টি হয়ে আছে।

ঘরে পান নেই, মা পান খায় না।

তাহলে থাক। কিছু লাগবে না।

শাহেদা চাদর গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় এলেন। নিজামউদ্দীন মধুর গলায় বললেন, আপার শরীরটা নাকি খারাপ?

না তেমন কিছু না। সামান্য গা গরম।

সামান্য বলে অবহেলা করবেন না। আপনার আমার যা বয়স–এই বয়সে সামান্য বলে কোনো কিছুকেই অবহেলা করতে নেই। নিজের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যাই হোক আপ–মেয়ের সঙ্গে কি কথা বলেছিলেন? ঐ যে বাড়ির বিষয়ে–বাড়িটা যে আমার লাগে।

এখানো বলি নি।

একটু যে তাড়াতাড়ি করতে হয় আপা। মাস শেষ হতে তো বাকি নেই।

ভাই সাহেব। আমাদের তো সময় দিতে হবে। বললেই তো বাসা পাওয়া যায় না। দু'টা মেয়ে নিয়ে যেখানে সেখানেও তো উঠতে পারি না।

আমি নাচার! সামনের মাসের ১ তারিখ থেকে বাড়ি আমার লাগবেই।

শাহেদা কিছু বললেন না। নিঃশ্বাস ফেললেন। নিজামউদ্দীন বললেন, মানুষের সমস্যা মানুষ ছাড়া কে দেখবে? মানুষই দেখবে। আমি তো আপনাদের সমস্যা অনেকদিন দেখলাম। এখন আপনারা আমার সমস্যা একটু দেখুন।

শাহেদা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, আমার কোন সমস্যা দেখেছেন? আমি তো বিনা ভাড়ায় আপনার বাড়িতে থাকি নি। যথানিয়মে ভাড়া দিয়েছি। ভাড়া দিতে কখনো কখনো দেরি হয়েছে কিন্তু দেয়া হয়েছে।

ভাড়ার কথা তো আপা আসছে না। আপনাদের বাড়ি দেয়ার জন্যে কতরকম সমালোচনা সহ্য করেছি। দশজনের দশ রকম কথা।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

কী কথা?

বাদ দেন, সব কথা শুনতে নাই।

না না বলুন কী কথা শুনেছেন?

এই যে ধরুন মিতু ছবিতে কাজ করে। এইসব কাজের ধরন-ধারণ তো আলাদা। রাত-বিরাত পার করতে হয়। এমনও হয়েছে–দুদিন-তিনদিন মেয়ের খোঁজ নাই। যে কাজের যে দস্তুর। সাধারণ মানুষ তো এইসব বুঝে না। অকথা-কুকথা বলে।

শাহেদা কাঁপা গলায় বললেন, আমার মেয়েকে নিয়ে কুকথা বলে? আমার মেয়েকে নিয়ে– যে মেয়ে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্যে দিনরাত খেটে মরছে সেই মেয়েকে নিয়ে কুকথা বলে?

এই তো আপা আপনি মনটা খারাপ করলেন। মন খারাপ করার কিছু নাই। দুনিয়ার এই হলো হাল। মানুষের মুখ তো আপনি বন্ধ করতে পারবেন না। এই পৃথিবীতে সবচে' খারাপ জায়গা হলো পায়খানা। মানুষের মুখ সেই পায়খানার চেয়েও খারাপ। পায়খানার দরজা বন্ধ করা যায়, তালা দেওয়া যায়–মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় না।

শাহেদা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আমি আপনার বাড়ি ছেড়ে দেব। এক তারিখের আগেই ছাড়ব। আমার মেয়ের কারণে আপনাকে কথা শুনতে হচ্ছে এটা যদি আগে জানাতেন আগেই ছেড়ে দিতাম।

নিজামউদ্দীন খুশি খুশি গলায় বললেন, তুচ্ছ ব্যাপার আপনার কানে তুলব কেন? আমার একটা বিবেচনা আছে না। আমার তো চোখ আছে। আমি দেখছি না–একটা বাচ্চা মেয়ে সংসার টানছে? বড় ভাই মানুষ খুন করে জেলে বসে আছে। লোকে কী বলে না বলে সেটা শুনলে দুনিয়া চলত না। শোনেন একটা ঘটনা বলি। ঘটনাটা না শুনলে বুঝতে পারবেন না।

থাক ঘটনা শুনতে হবে না।

আপা শোনেন। শোনার দরকার আছে–গত জুম্মাবারে জুম্মা পড়ে বাসায় ফিরছি। ইসলাম সাহেব পথে আমাকে ধরলেন। ইসলাম সাহেব আমার ভাড়াটে-অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজার। আমাকে বললেন...

আমার শরীরটা ভালো না। কিছু শুনতে ভালো লাগছে না।

থাক তাহলে। মানুষের কানকথা যত কম শোনা যায় ততই ভালো, শুনলেই বিপদ। আপা তাহলে উঠি?

জ্বি আচ্ছা।

তাহলে এই কথা রইল— মাসের এক তারিখ ইনশাল্লাহ্ ঘর খালি করে দিচ্ছেন।

বললাম তো দিব।

আলহামদুলিল্লাহ। সত্যি কথা বলতে কি আপা একশ একটা পাপ করার পর লোকে ভাড়াটে হয়। টু লেট সাইন ঝুলালে ভাড়াটে পাবেন না। যখন ভাড়াটে তুলতে যাবেন এরা উঠবে না। যেন তাদের বাপের বাড়ি...

শাহেদা বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন, রাতের রান্না কিছু হয় নি। ঝুমুরকে বলেছেন একার জন্যে চারটা চাল ফুটিয়ে ডিম ভেজে খেয়ে নিতে। ঝুমুর এখনো চুলা ধরায় নি। শাহেদা ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, ঝুমুর।

ঝুমুর দরজা ধরে দাঁড়াল।

তোর নিজের জন্যে দু'টা ভাত রেঁধে ফেল, আমি খাব না।

আমিও খাব না।

রাতে না খেয়ে থাকবি?

হুঁ।

করা যা ইচ্ছা। তোর আপা কি বলেছে–রাতে ফিরবে না?

না, সারারাত শুটিং চলবে। তোমার কি মাথায় যন্ত্রণা?

হুঁ।

মাথা টিপে দেব?

কিছু করতে হবে না। তুই ঘরের বাতি নিভিয়ে চলে যা।

মশারি খাটিয়ে দেব? মশা আছে তো।

যেতে বললাম না!

ঝুমুর মা'র ঘর থেকে চলে এলো। তার টেস্ট পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ন'তারিখ থেকে। বই নিয়ে বসতে ইচ্ছা করছে না। এমনিতে সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারে কিন্তু বই নিয়ে বসলেই শুধু হাই ওঠে।

ঝুমুর খাটের উপর পা তুলে বসল। বই নিয়ে বসবে কি বসবে না ঠিক করতে পারল না। কারো সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা করছে— গল্প করার মানুষ নেই। কথা শুনতে ভালবাসে এমন কোনো ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে সে বেঁচে যায়। সমস্ত পুরুষদেরকে ঝুমুর তিন ভাগে ভাগ করেছে–

এক, এরা কথা শুনতে ভালোবাসে। স্বামী হিসেবে এরা আদর্শ।

দুই, এরা কথা বলতে ভালোবাসে। স্বামী হিসেবে এরা মোটামুটি।

তিন, এরা কথা শুনতেও ভালবাসে না, বলতেও ভালোবাসে না। স্বামী হিসেবে এরা ভয়াবহ।

মবিন ভাই কোন শ্রেণীর ঐ প্রথম শ্রেণীর? পুরোপুরি না। তিনি কথা শোনার চেয়ে বলতে বেশি পছন্দ করেন। স্বামী হিসেবে মবিন ভাইকে আদর্শ বলা যাবে না। উনার বেশি বুদ্ধি। স্বামীদের কম বুদ্ধি থাকা ভালো। বেশি বুদ্ধির মানুষরা নানান ধরনের চালাকি করে।

ঝুমুর।

জ্বি।

এক গ্রাস পানি দিয়ে যা।

ঝুমুর উঠে গিয়ে পানির গ্লাস ভর্তি করে পানি নিয়ে গেল। বাতি জ্বালাল।

শাহেদা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, বাতি নেভা। বাতি জ্বেলেছিস কেন?

অন্ধকারে পানি খাবে কীভাবে?

ঝুমুর লক্ষ করল পানির গ্লাস হাতে নিতে গিয়ে শাহেদার হাত কাঁপতে লাগল। ঝুমুর বলল, মা তোমার কি জ্বর বেড়েছে?

জানি না। বাতি নিভিয়ে চলে যা।

তুমি আমার সঙ্গে অকারণে এত রাগারগি করছ কেন? বাড়িওয়ালা চাচার কথা শুনে তুমি রেগেছ–সেই রাগ ঝাড়ছ আমার উপর। মানুষ কত কথা বলবে–তাই শুনে রেগে যেতে হবে?

কুৎসিত কথা শুনব তার পরেও রাগিব না?

কুৎসিত কথা তো আমি সারাক্ষণই শুনি–আমি কি রাগ করি? রাগ করি না। আমি থাকি আমার মতো।

তুই সারাক্ষণ কুৎসিত কথা শুনিস?

হ্যাঁ।

কে বলে?

স্কুলের মেয়েরা বলে। সেদিন জিওগ্রাফি আপা আমাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন...

কী জিজ্ঞেস করলেন?

হেনতেন নানান কথা, সংসার চলে কী করে? বড় বোন কী করে। এইসব জাবিজাবি।

কই আমাকে তো কোনোদিন কিছু বলিস নি।

তোমাকে শুধু শুধু বলব কেন? তাছাড়া আমি একজনের কথা আরেকজনকে বলি না।

ঝুমুর, তুই আমার কাছে এসে বোস।

কেন?

বসতে বলছি বোস।

তুমি এমনভাবে বলছি যে মনে হচ্ছে তুমি আমাকে মারবে।

মারব না, কাছে আয়। বোস এখানে–তোর আপার সঙ্গে তুই তো গুটিগুটি করে অনেক কথা বলিস। সে কি কখনো তোকে গোপন কিছু বলেছে?

না। আপার স্বভাব হলো চুপচাপ থাকা। বকবক যা করার আমিই করি। আপা শুধু শুনে যায়। আপা পুরুষ মানুষ হলে খুব ভালো স্বামী হত।

শাহেদা ভুরু কুঁচকে তাকালেন। ঝুমুর বিরক্ত গলায় বলল, তুমি এভাবে তাকিয়ো না–তোমাকে আমাদের জিওগ্রাফি আপার মতো লাগছে।

শাহেদা চাপা গলায় বললেন, তোর আপার সঙ্গে রাতে যখন ঘুমাস সে কিছুই বলে না?

ঘুমের মধ্যে কথা বলবে কীভাবে! আপা ক্লান্ত হয়ে থাকে, মরার মতো ঘুমায়। মাঝে মাঝে...

মাঝে মাঝে কী?

মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসে। দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কাঁদে।

তুই তখন কী করিস?

কিছুই করি না। ভান করি যেন মরার মতো ঘুমুচ্ছি।

ও কেন কাঁদে।

আমি কী করে জানিব কেন কাঁদে? সে যেমন রাতে মাঝে মাঝে কাদে, তুমিও কাঁদ। তুমি কেন কাঁদ সেটা যেমন আমি জানি না, আপা কেন কাঁদে সেটাও জানি না–জানতে ইচ্ছাও করে না।

শাহেদ ক্লান্ত গলায় বললেন, সেই ইচ্ছা করবে কেন? সংসারের কোনো কিছু নিয়ে তো তোকে ভাবতে হচ্ছে না। দিব্যি খাচ্ছিস, ঘুমুচ্ছিস–গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরছিস।

তুমি আমার উপর শুধু শুধু রাগ করছ। রাগ করার মতো যখন কিছু করব তখন রাগ কোরো। তোমাকে বেশি দিন অপেক্ষাও করতে হবে না। রাগ করার মতো কিছু খুব শিগগিরই করব।

সেটা কী?

টেস্ট পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে গোল্লা খাব।

শাহেদা কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলেন। ঝুমুর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, মা তোমাকে একটা কথা বলি মন দিয়ে শোন–আপা কী করে সংসার চালাচ্ছে সেটা তুমি খুব ভালো করেই জান। তুমি ভান করছ, তুমি কিছু জান না। আমিও ভান করছি আমি কিছু জানি না। এটা কি মা ঠিক হচ্ছে?

শাহেদা তাকিয়ে আছেন। পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছেন। তার হাত-পা থারথার করে কঁপিছে। ঝুমুর উঠে দাঁড়াল। শান্ত ভঙ্গিতে ঘরের বাতি নিভিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। সেখান থেকে চলে গেল বারান্দায়। বারান্দায় দেয়াল ঘেসে মোড়া পাতা। দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝুমুর বসেছে।

বাইরে সুন্দর জোছনা। খানিকটা জোছনা বারান্দায় এসে পড়েছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জোছনা নেমেছে। বারান্দায় সুন্দর পাতার নকশা। বাতাসে পাতা কাঁপছে–জোছনার নকশাও কাঁপছে। ঝুমুর সেই অপূর্ব নকশার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে।

ভেতর থেকে শাহেদা ডাকলেন, ঝুমুর, ঝুমুর।

ঝুমুর জবাব দিল না। সে চোখের পানি মুছে খালি চেয়ারটা নিজের পাশে টেনে আনল। তার কাছে এখন মনে হচ্ছে –খালি চেয়ারে তার স্বামী বসে আছে। সে তাঁর পায়ের কাছাকাছি বসেছে। ঝুমুর বলল, ঘুমাবে না?

সে বলল, না।

ঘুমাবে না কেন? রাত তিনটা বাজে।

তুমি বডড বিরক্ত কর ঝুমুর। দেখছ না জোছনা দেখছি।

তুমি কি কবি যে তোমাকে হাঁ করে জোছনা দেখতে হবে?

হ্যাঁ আমি কবি।

কবিরা জোছনা দেখে না। তারা তাদের স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কে বলেছে তোমাকে?

আমি জানি। এখন তুমি আমার দিকে তাকাও।

উফ! তুমি কী যে বিরক্ত কর!

আমার দিকে না তাকালে আমি আরো বিরক্ত করব।

সে ঝুমুরের দিকে তাকাল। তাকিয়েই হেসে ফেলল। এত সুন্দর করে সে হাসল যে হাসি দেখে ঝুমুরের চোখে পানি এসে গেল।

ভেতর থেকে শাহেদা আবারো ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, ঝুমুর।

ঝুমুর কঠিন স্বরে বলল, ডাকাডাকি করবে না মা, আমি আসব না।

না, ঝুমুর যাবে না। সে বারান্দায় বসে থাকবে–সারারাত বসে থাকবে। পাশে বসে থাকা মানুষটার সঙ্গে কথা বলবে। ওকে একা রেখে সে যেতে পারবে না। পাশে বসা মানুষটা বলল, পানি খাব ঝুমুর।

ঝুমুর বলল, না তুমি পানি খাবে না। পানি খাবার কথা বলে তুমি আমাকে ভেতরে পাঠাতে চাচ্ছ। ভেতরে গেলেই মা'র কাছে যেতে হবে। মা'র কাছে গেলে আমি আর আসতে পারব না। তোমার সঙ্গে গল্প করাও হবে না।

মা'কে তুমি ভালোবাস না?

না, আমি কাউকেই ভালোবাসি না।

আমার ধারণা তুমি রাগ করে এ রকম কথা বলছি–আসলে তুমি সবাইকে ভালোবাস।

তোমার ধারণা নিয়ে তুমি বসে থাক।

কী ব্যাপার, তুমি দেখি আমার উপরও রাগ করছ।

আমি সবার উপরই রাগ করছি।

কিছুক্ষণের জন্যে কি রাগ বন্ধ করা যায়?

যায়।

বেশ, রাগটা খানিকক্ষণের জন্যে ধামাচাপা দাও। ধামাচাপা দিয়ে আমার হাত ধরে বস। গল্প কর।

কী গল্প?

যে-কোনো গল্প। তোমার বাবার গল্প বল।

বাবার কোনো গল্প নেই। ভালোমানুষ ছিলেন–হঠাৎ একদিন মরে গেলেন। ব্যাস।

তোমাদের ভালোবাসতেন না?

বাসতেন?

খুব ভালোবাসতেন, না মোটামুটি?

ভাইয়াকে খুব ভালোবাসতেন। ভাইয়াকে ডাকতেন ভোম্বল সিং। ছোটবেলায় গোব্দা গোদা ছিল তো–ভোম্বল সিং নাম দিয়েছিলেন–বড় হয়েও সেই নাম। ভাইয়া কত রাগ করেছে, কান্নাকাটি করেছে, লাভ হয় নি। বাবা ভোম্বল সিং ডাকবেই।

তোমার ভাইয়া বাবাকে কেমন ভালোবাসত?

ভাইয়া ভালোবাসত টাসত না, বাবাকে এড়িয়ে চলত। বাবার খুব চিড়িয়াখানা দেখার শখ। আমরা ঢাকায় থাকতাম, উনি থাকতেন সিলেটের জঙ্গলে।। যতবার ঢাকায় আসতেন ঘ্যান ঘ্যান করতেন–ভোম্বল সিং, চল যাই চিড়িয়াখানা দেখে আসি। ভাইয়া যাবে না। কত সাধাসাদি। শেষটায় মন খারাপ করে আমাকে নিয়ে যেতেন। বাবা ঢাকা এসেছেন অথচ চিড়িয়াখানায় যান নি–এরকম কখনো হয় নি। বাবা কীভাবে মারা গোল সেটা শুনবেন?

বল।

গরমের সময় হঠাৎ ছুটি নিয়ে ঢাকা চলে এলেন। মা'কে বললেন, একা একা থাকতে অসহ্য লাগে। তোমরা এক জায়গায়-আমি অন্য জায়গায়। উপায়ও নেই, জঙ্গলের মধ্যে তোমাদের আমি কোথায় রাখব? বাচ্চাদের পড়াশোনা। মন মানে না বলে ছুটি নিয়ে চলে আসি। ভাবছি টাকা-পয়সা প্রভিডেন্ট ফান্ডে যা আছে তাই নিয়ে ব্যবসা করব। মা বলল, তাই কর। চাকরি যথেষ্ট হয়েছে।

এই বয়সে সিরিয়াস ব্যবসা তো পারব না। টাকা-পয়সা যা আছে তা দিয়ে একটা ফার্মেসি দেব। তার আয়ে সংসার চলবে। কেমন হবে বল তো?

ভালোই হবে।

ছেলেমেয়ের জন্যেই তো সংসার। সেই ছেলেমেয়েই যদি চোখের সামনে না থাকল তাহলে সংসার করে লাভ কী?

ঠিকই বলেছ।

এবার ফিরে গিয়েই চাকরি ছাড়ার ব্যবস্থা করব। যথেষ্ট হয়েছে। আর সহ্য হচ্ছে না।

চাকরি ছেড়ে দেবেন। এই সিদ্ধান্ত নেবার পর বাবা খুব খুশি। সবাইকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাবেন। মা-ও যাচ্ছেন। শুধু ভাইয়া যাবে না। জন্তু-জানোয়ার তার নাকি ভালো লাগে না। বাবা কত অনুরোধ করলেন। লাভ হলো না। শেষে মন খারাপ করে বাবা আমাদের নিয়েই গেলেন। বাঁদর দেখলেন, ময়ুর দেখলেন, হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পায়ে ব্যথা–বাবা

নির্বিকার। বিকেলে চিড়িয়াখানা থেকে ফিরে এসে বাবা বললেন, শাহেদা আমার শরীরটা যেন কেমন করছে।

মা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, কেমন করছে মানে কী?

বুঝতে পারছি না। কী রকম যেন লাগছে–ভোম্বল সিং কোথায়?

ও গেছে বন্ধুদের বাসায়। ডাক্তার ডাকতে হবে?

বুঝতে পারছিনা। হঠাৎ প্রেসার বেড়ে গেল কিনা, সব কেমন যেন অন্ধকার লাগছে। ধোঁয়া ধোঁয়া।

এইসব কী বলছ?

ভোম্বল সিং কোথায়? ভোম্বল?

আপা ছুটে গেল। ডাক্তার ডাকতে। আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরে থাকলাম, মা কাঁদতে লাগল। বাবা শুধু একটু পর পর বলতে লাগল–ভোম্বল কোথায়? ভোম্বল সিং?

ঠিক দু'ঘণ্টার ভেতর বাবা মারা গেলেন। আমরা হাসপাতালে নেবারও সময় পেলাম না। ভাইয়া বাসায় ফিরাল সন্ধ্যার পর। বাসায় তখন অনেক লোকজন। ভাইয়া অবাক হয়ে বলল, ব্যাপার কী? কী হয়েছে?

তারপর?

তারপর আবার কী? কিছু না।

তোমার ভাইয়া বাবার মৃত্যু কীভাবে গ্রহণ করল?

জানি না। কীভাবে গ্রহণ করল। সে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ফিরে এল তিনদিন পর। বাবার এর মধ্যে কবর হয়ে গেছে। ঘরে লোকজনের ভিড় নেই। মা'র হার্টের অসুখের মতো হয়েছে–বিছানায় শোয়া। ডাক্তার তাঁকে কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়েছে। ঘুমের ওষুধ খায়–ঘুমুতে পারে না–ঝিম মেরে পড়ে থাকে।

ভাইয়া ফিরে এসে সংসারে হাল ধরল। তার তখন কত বয়স? বি এ ফাস্ট ইয়ারে পড়ে। চাকরি বাকরির অনেক চেষ্টা করল, পেল না। বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ড দিয়ে ব্যবসার চেষ্টা করল। হেন ব্যবসা নেই যা সে করে নি। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পরিশ্রম। মানুষ যে কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারে আপনি ভাইয়াকে সেই সময় না দেখলে বিশ্বাস করবেন না, এক সময় খবর পেল এফডিসিতে মালামাল সাপ্লাইয়ের ভালো ব্যবসা আছে। ইনভেস্টমেন্ট কম, লাভ বেশি। শুরু করল সেই ব্যবসা।

লাভ হলো?

মোটামুটি হলো। ভাইয়ার ভাগ্য ছিল খারাপ। খারাপ ভাগ্যের মানুষ তো খুব ভালো কিছু করতে পারে না।

উনি মানুষ খুন করলেন কেন?

সেটা আমি আপনাকে বলব না। সব কথা বলতে নেই। কিছু কিছু কথা না বলাই ভালো। হয়েছে কী জানেন? ভাইয়া তো গভীর রাতে ফেরে, সেদিন হঠাৎ দুপুরে এসে হাজির। আমাকে বলল, খুকি চিড়িয়াখানায় যাবি? ভাইয়া আমাকে ঝুমুর ডাকত না, ডাকত খুকি। ভাইয়া আমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে চায় শুনে আমি অবাক হলাম না। কারণ আমি জানতাম বাবার মৃত্যুর পর ভাইয়া প্রায়ই চিড়িয়াখানায় যায়। বানরের খাচার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি বললাম, হ্যাঁ ভাইয়া যাব। আমি কাপড় পরে তৈরি হয়েছি। ভাইয়া বলল–না থাক। তখন আমরা মগবাজারের একটা বাসায় থাকতাম। ছোট একতলা বাসার একদিকে আমরা অন্যদিকে হাফিজ সাহেব বলে এক ভদ্রলোক আর তার স্ত্রী, দুই ছেলে। সেদিন ভাইয়া সেই যে দুপুরে এসেছে আর বেরুচ্ছে না। সন্ধ্যাবেলায় মা বললেন–কী-রে তোর কি শরীরটা খারাপ?

ভাইয়া বলল, হঁ।

জ্বর-টর নাকি রে দেখি কাছে আয় তো।

ভাইয়া বলল, দেখতে হবে না। জ্বর টর কিছু হয় নি। রাতে ভাইয়া ভাত খেল না। ন'টার সময় ঘুমিয়ে পড়ল। সে বাইরের ঘরে ঘুমাল। আমি গিয়ে দেখি মশা ভিনভন করছে–এর মধ্যেই ভাইয়া ঘুমাচ্ছে। আমি মশারি খাটিয়ে দিলাম। ভাইয়া রাত বারটার দিকে জেগে উঠল। নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের কেতলি বসাল। খটখট শব্দ শুনে মা জেগেছে। রান্নাঘরে ঢুকে অবাক হয়ে বলল, তুই এখানে কী করছিস, ভাইয়া হাসিমুখে বলল, চা বানাচ্ছি। তুমি খাবে মা? মা বলল, না। ভাইয়া বলল, খাও না। দেখ আমি কী সুন্দর চা বানাই! ভাইয়া চা বানোল। মা'কে নিয়ে দু'জনে মিলে চা খেল। তার কিছুক্ষণ পর দরজার

কলিংবেল বাজতে লাগল। মা বললেন, কে? পাশের ঘরের হাফিজ সাহেব বললেন, খালাম্মা দরজা খুলুন। পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।

মা হতভম্ব হয়ে দরজা খুললেন। আমি তখন জেগেছি, আপা জেগেছে। আমরা বুঝতেই পারছি না। কী হচ্ছে। আমরা দেখলাম, অনেকগুলো পুলিশ বাড়িতে ঢুকাল। ওরা বিছানা, বালিশ, খাট, মিটসেফ ওলট-পালট করতে লাগল। আপা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ভাইয়া কী ব্যাপার? ভাইয়া জবাব দিল না। একজন পুলিশ অফিসার বললেন, ভয়ের কিছু নেই। রুটিন চেক। আমরা এক্ষুণি চলে যাব।

তারা কিছুক্ষণের মধ্যে চলে গেল, তবে যাবার সময় ভাইয়াকে নিয়ে গেল। আপা বললেন, ভাইয়াকে কোথায় নিচ্ছেন? পুলিশ অফিসার বললেন, থানায় দুএকটা প্রশ্নট্রিশ্ন জিজ্ঞেস করে ছেড়ে দেব। আজ রাতেই ছেড়ে দেব। ভয়ের কিছু নেই।

পুলিশ ভাইয়াকে ছাড়ল না। এই যে ভাইয়া গেল আর বাসায় ফিরল না। পরদিন ভোরবেলা আপা আমাকে নিয়ে থানায় গেছে। ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হলো হাজতে। ভাইয়া আপার দিকে তাকিয়ে বলল, এখানে ঘোরাঘুরি করে লাভ নেই। বাসায় চলে যা। আমি একটা খুন করেছি। পুলিশের কাছে স্বীকার করেছি।

ঝুমুর।

ঝুমুর পেছন ফিরল। শাহেদা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখে বিস্ময় ও ভয়। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছিস?

ঝুমুর বলল, কারো সঙ্গে না। নিজের মনে কথা বলছি।

আয় ঘুমুতে আয়।

ঝুমুর বলল, আমি আরো কিছুক্ষণ বসে থাকব।

দুপুররাতে একা একা বারান্দায় বসে থাকবি এটা কেমন কথা? আমার বসে থাকতে ভালো লাগছে মা। আয় লক্ষ্মীসোনা, ঘরে আয়। শাহেদা বারান্দায় এসে ঝুমুরের হাত ধরলেন। ঝুমুর আপত্তি করল না, উঠে এলো। শাহেদা বললেন, রাতে তো কিছু খাস নি। খিদে হয়েছে, কিছু খাবি? একটা পরোটা ভেজে দেব?

দাও, তোমার শরীরটা এখন ভালো লাগছে মা?

শাহেদা জবাব দিলেন না। রান্নাঘরে ঢুকলেন। পরোটা বানানো গেল না। ময়দা শেষ হয়ে গেছে। তিনি ভুলে গেছেন। ময়দার কথা মিতুকে বলা হয়েছে–ভোরবেলা সে নিয়ে আসবে।

শাহেদা বললেন, চারটা চাল ফুটিয়ে দিই?

ঝুমুর বলল, কোনো কিছু ফুটিয়ে দিতে হবে না। তুমি ব্যস্ত হয়ে না। এক গ্লাস শরবত খেতে পারি। ঘরে কি চিনি আছে মা?

শাহেদা দেখলেন চিনির কোটাও খালি। ঝুমুর বলল, একেকটা দিন খুব অদ্ভুত হয়। কিছু পাওয়া যায় না। আবার কোনো কোনো দিন আছে–সব পাওয়া যায়। সেদিন তুমি যা চাইবে তাই পাবে।

শাহেদা শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। রান্নাঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে ঝুমুর। মেয়েটাকে আজ অনেক বড় বড় লাগছে। ঝুমুর বলল, মা শোন, আপার একটা কথা তোমাকে বলি– আপাকে নিয়ে মাঝে মাঝে তুমি দুশ্চিন্তা কর। আজেবাজে কথা ভাব। এইসব ভাবার কোনো কারণ নেই। আপা মরে যাবে তবুও অন্যায় কিছু করবে না।

শাহেদার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঝুমুর বলল, সিনেমার কাজ, শুটিঙের কাজ–রাত দিন বাইরে থাকতে হয় বলে লোকজন আজেবাজে কথা বলে। ওদের আজেবাজে কথা বলার কোনো কারণ নেই।

শাহেদা কাপা গলায় বললেন, সেইটাই তো আমি বলি মা। আমার নিজের মেয়ে আমি তাকে জানি না?

লোকজনের আজেবাজে কথা বলার কোনো অধিকারও নেই। আপা কি সামান্য চাকরির জন্যে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যায় নি? কেউ কি দিয়েছে তাকে কিছু জোগাড় করে? আজি কোন বড় বড় কথা বলে?

শাহেদার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখ মুছলেন। চোখ মুছতে মুছতে বললেন–তুই যে বললি ও রাতে ঘুম থেকে উঠে কাঁদে। কাঁদে কেন?

মনের দুঃখে কাঁদে। আমার মনে হয় বেশিরভাগ সময় মবিন ভাইয়ের জন্যে কাঁদে। প্রায়ই তো মবিন ভাইয়ের টিউশ্যানি চলে যায়। বেচারার প্রায় না খেয়ে থাকার মতো জোগাড়

হয়। একবার কী হয়েছে জান মা? প্রায় দশদিন মবিন ভাই ভাত খায় নি। যে হোটেলে বাকিতে খেত তারা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে...

থাক এসব শুনতে চাচ্ছি না।

শোন না মা—মবিন ভাই বাধ্য হয়ে চিড়া আর গুড় কিনে আনল। চিড়া পানিতে ভিজিয়ে গুড় দিয়ে খায়। আপা জানতে পেরে হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে এসে খুব কাঁদছিল।

শাহেদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ঝুমুর এসে মায়ের পাশে বসল। কোমল গলায় বলল, তুমি মবিন ভাইয়ের সঙ্গে আপার বিয়ে দাও মা। ওরা কয়েকটা দিন আনন্দ করুক।

ও বউকে খাওয়াবে কী?

চিড়া আর গুড় খাওয়াবে। তাতে কী মা? ওরা দু'জন যখন বারান্দায় বসে গল্প করবে তখন দেখো তোমার কত ভালো লাগবে।

শাহেদা দেখলেন ঝুমুরের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে।

প্রেম দেওয়ানার ডাবিং

আজমল তরফদারের ছবি ‘প্রেম দেওয়ানা’র ডাবিং শুরু হয়েছে। ডাবিং স্টুডিওতে জমজমাট অবস্থা। ন’টা থেকে শিফট শুরু হলেও স্টার সুপারস্টাররা দশটা-এগারটার দিকে আসেন। যিনি যত বড়ো স্টার তিনি আসবেন তত দেরিতে। গ্যালাক্সি স্টার ফরহাদের সেই হিসেবে বারটার দিকে আসার কথা। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় তিনি সকাল ন’টার সময় চলে এসেছেন। তাঁর মুডও আজ খুব ভালো। গাড়ি থেকে নেমেই চেঁচিয়ে বললেন, আজমল ভাই জম্পেশ করে চা বানান দেখি। আপনার ব্যাটেলিয়ান রেডি?

হ্যাঁ রেডি।

দেখবেন ইনশাল্লাহু চল্লিশ লুপ এক শিফটে নামিয়ে দেব। ম্যাডাম এসেছেন?

এখনো আসেন নি।

ডায়ালগ দিতে বলুন। বসে বসে মুখস্থ করতে থাকি। চা তো এখনো দিল না।

ফরহাদ সাহেব ডাবিং রুমে ঢুকে গেলেন।

আজমল তরফদারের সঙ্গে বিমল দাঁড়িয়ে আছে। সে এসেছে বিশেষ কারণে, রেশমাকে বড় সাহেবের অফিসে নিয়ে যেতে হবে। বড় সাহেব খবর পাঠিয়েছেন। রেশমা’র আজ ডাবিং আছে। সে ন’টার আগেই এসে পড়ে। আজই শুধু দেরি হচ্ছে।

বিমল ফরহাদকে দেখিয়ে নিচু গলায় বলল, উনি কি আপনার ছবির হিরো?

হুঁ। যা তা হিরো না গ্যালাক্সি হিট হিরো।

আমাদের ছবিতে কি উনি থাকছেন?

হুঁ। না থাকলেই ভালো হত।

কেন?

গাধা। অভনয় জানে না।

তাহলে তাকে নিচ্ছেন কেন?

রিকশাওয়ালারা তাকে দেখতে চায়।

তাকে কি নতুন ছবির কথা বলা হয়েছে?

এখনো বলা হয় নি, তবে সে জেনে গেছে যে আমরা বড় বাজেটে নামছি। ছবি পাড়ায় খবর হয়ে গেছে। আজ যে ন'টার সময় উপস্থিত–এই কারণেই উপস্থিত।

আপনাকে খাতির করা শুরু করেছে?

হুঁ।

লুপ লাগানো হয়েছে। খণ্ড খণ্ড দৃশ্য বড় পদায় দেখানো হচ্ছে। ছবি দেখে দেখে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ডায়ালগ বলবেন, ম্যাগনেটিক ফিতায় সেই শব্দ ধরা হবে। পরে একসঙ্গে জোড়া লাগানো হবে।

বিমল বলল, ব্যাপারটা তো খুব ইন্টারেস্টিং।

কাগজে-কলমে খুব ইন্টারেস্টিং। তবে কাজ শুরু হলে দেখবে কত ঝামেলা। ঠোঁট মেলানো যায় না। ডায়ালগ যায় একদিকে ঠোঁট নড়ে অন্যদিকে।

কাজ শুরু হবে কখন?

ম্যাডাম এলেই শুরু হবে।

ফরহাদ সাহেব চায়ের কাপ এবং হাতে স্ক্রিপ্ট নিয়ে আজমল তরফদারের কাছে চলে এলেন।

কাজ শুরু হবে। কখন আজমল ভাই?

এই তো অল্প কিছুক্ষণ।

আপনার সঙ্গে বসে গল্পগুজব করি? নতুন বই নাকি করছেন? বিগ বাজেট মুভি।

হ্যাঁ।

স্টোরি লেখা হয়েছে?

হচ্ছে।

নায়ক-নায়িকা কয় পেয়ার? ওয়ান ওর টু?

এখনো কিছুই ঠিক হয় নি।

আর্টিস্টের ব্যাপারে কিছু ভাবছেন?

এখনো ভাবি নি।

আমার অবশ্য দম ফেলার সময় নেই। হেভি বুকিং। তারপরেও আপনার ব্যাপার অন্য।

থ্যাংক য়্যু।

আপনার 'প্রেম দেওয়ানা'ও হিট করবে। ডায়ালগ মারাত্মক। হিট ডায়ালগ। ডায়ালগের জন্যে উঠে যাবে....

কথাবার্তার এই পর্যায়ে ডাবিং স্টুডিওর দরজা ফাঁক করে রেশমা তাকাল। আজমল তরফদার ফরহাদ সাহেবের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললেন, রেশমা এস এস।

রেশমা পুরোপুরি হকচাকিয়ে গেল। আজমল তরফদার এরকম অন্তরিক ভঙ্গিতে ডাকবেন ভাবাই যায় না। সে দেরি করে এসেছে বলেই কি রসিকতা করছেন? এখনই কুৎসিত গালি শুরু হবে? হলভর্তি মানুষের সামনে গালি শুনতে এত খারাপ লাগে। তার হাত-পা জমে যাবার মতো হলো।

দাঁড়িয়ে আছ কেন, আস? পরিচয় করিয়ে দিই— এ হলো বিমল। বিমলচন্দ্র হাওলাদার। বিমল এর নাম রেশমা।

বিমল তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে। বিনীতভাবে সে সালাম দিল। ফরহাদ পর্যন্ত অবাক হয়ে তাকাচ্ছে।

রেশমা ইতস্তত করে বলল, বাসের চাকা পাংচার হয়ে গিয়েছিল। ঠিক করল। এই জন্যে দেরি হয়েছে।

আজমল তরফদার বললেন, নো প্রবলেম। এগারটার আগে ডাবিং শুরু হবে না। তোমার বোধহয় দু'টা লুপ। এক সময় করে ফেললেই হবে। বিমল তোমাকে নিতে এসেছে। ওর সঙ্গে একটু যাও।

কোথায় যেতে হবে, কী ব্যাপার। এইসব কিছুই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। রেশমা'র মনে হলো সে পালিয়ে যেতে পারলে বাচে।

আজমল তরফদার বললেন, রেশমা তুমি কি চা খেয়ে যেতে চাও r চা হয়ে গেছে। এক কাপ চা খেয়ে যাও।

ডাইরেক্টর সাহেবের জন্যে আলাদা সুন্দর কাপে চা আসে। আজমল তরফদার নিজেই তার চায়ের কাপ এগিয়ে ধরলেন।

রেশমা ক্ষীণ গলায় বলল, চা খাব না।

আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি ফিরে এসে চা খেয়ো, এখন বরং বিমলের সঙ্গে চলে যাও।

ডাবিং স্টুডিওর সামনে কালো রঙের বিরাট একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির জানালার কাচে পর্দা দেয়া। বিমল এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। আশপাশের লোকজন কৌতুহলী চোখে তাকে দেখছে। তারচেয়েও বড় কথা আজমল তরফদার তাকে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছেন।

মোবারক সাহেবের চোখে রিডিং গ্লাস। অর্ধচন্দ্রাকৃতি চশমা। এই চশমার অসুবিধা এই যে, যার দিকে তাকানো হয়। সে চোখ দেখতে পায়। তিনি কাউকে তার চোখ দেখাতে চান না। তাঁর ধারণা শরীরের যেমন পোশাকের প্রয়োজন, চোখের তেমন পোশাক দরকার। নগ্ন চোখ নগ্ন শরীরের মতো।

মোবারক সাহেব বললেন, বোস, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

রেশমা বসল। জড়োসড়ো হয়ে বসল। মেয়েটিকে তিনি আগে একবারই দেখেছেন। সে দেখা রাতের দেখা। দিনে কখনো দেখেন নি। এখন ঝকঝকে দিন। ঘড়িতে বাজছে বারটা

একুশ। রাতের দেখা মানুষ দিনের আলোয় সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে যায়। এই মেয়েটার ক্ষেত্রে সে রকম ঘটে। কিনা তাঁর জানার ইচ্ছা।

মেয়েটি সাজগোজ করে নি। ঐ রাতে বেশ সেজেছিল। কপালে টিপ ছিল। ঠোঁটে লিপস্টিক ছিল। আজ কপাল শূন্য, ঠোঁটেও লিপষ্টিক নেই। মেয়েটি কোলের উপর হাত রেখে বসেছে বলে তিনি তার হাত দেখতে পাচ্ছেন না। ঐ রাতে মেয়েটির হাতে সবুজ রঙের কাচের চুড়ি ছিল। আজ বোধ হয় চুড়ি পরে নি। চুড়ি পরলে চুড়ির টুংটং আওয়াজ কানে আসত।

তোমার নাম টেপী তাই তো?

রেশমা জবাব দিল না। চুপ করে বসে রইল। মোবারক সাহেব চোখ থেকে রিডিং গ্রাস পুরোপুরি খুলে ফেললেন। তাঁর যে শুধু কাছে দেখার সমস্যা তাই না—মায়োপিয়া আছে বলে দূরের জিনিসও ভালো দেখতে পান না। মেয়েটিকে ভালোমতো দেখার জন্যে অন্য একটা চশমা দরকার। তিনি ড্রয়ার খুললেন। চশমা বের করে পরলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকলেন।

ঐ দিন তুমি মিথ্যা করে কেন বললে তোমার নাম টেপী, বোনের নাম হ্যাপী? মিথ্যা বলার প্রয়োজন ছিল কি?

ছিল।

আসল নাম, পরিচয় কাউকে জানতে দিতে চাও না, এই তো ব্যাপার?

জ্বি।

যে তোমার সত্যিকার পরিচয় বের করতে চায় তার জন্যে তো খুব সমস্যা হবার কথা না?

কেউ সত্যিকার পরিচয় বের করতে চায় না।

তুমি চা বা কফি খাবে?

জ্বি না।

তুমি সিনেমার লাইনে, সেখান থেকে নতুন পেশায় কীভাবে চলে এলে?

আমি বলতে চাচ্ছি না।

বলতে চাচ্ছ না কেন?

বলতে ইচ্ছা করছে না। গল্প করার মতো মজার কোনো বিষয় এটা না।

আমি তো গল্প করছি না। জানতে চাচ্ছি।

জানতে চাচ্ছেন কেন?

কৌতুহল বলতে পার। তোমার এক ভাই তো জেলে আছে। ও জেলে গেল কেন?

ও জেলে আছে সেটা যখন জানেন তখন জেলে কেন সেটাও জানা আপনার জন্যে কোনো সমস্যা না।

তুমি বলতে চাচ্ছ না।

জ্বি না।

মোবারক সাহেব ইন্টারকমে বোতাম টিপে দু'গ্লাস পানি দিয়ে যেতে বললেন। পানি সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। তিনি নিজে এক গ্লাস পানি নিলেন। রেশমার দিকে একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিলেন।

নাও পানি খাও।

আমার তৃষ্ণা পায় নি। আমি পানি খাব না।

ঐ রাতে তুমি তো বেশ হাসিখুশি ছিলে–গল্প করছিলে, আজ এমন গভীর হয়ে আছ কেন?

ঐ রাতে আপনি আমাকে কী জন্যে ডেকে এনেছিলেন আমি জানতাম। আজ কী জন্যে এনেছেন আমি জানি না।

তোমাকে কী জন্যে আনা হয়েছে তুমি জান না?

জ্বি না।

অনুমান করতে পারছি? না তাও পারছি না?

পারছি না।

ঐ দিন তোমাকে কিছু টাকা দিয়েছিলাম। টাকা ফেলে চলে গেলে কেন?

রাগ হয়েছিল। ঐ জন্যে ফেলে চলে গেছি।

তুমি যে জীবনযাপন করছ, সে জীবনে কি টাকার উপর রাগ করা মানায়?

না মানায় না। আপনার টাকা আমি নিয়েছি। সংসারে খরচ করেছি।

তুমি তোমার একটা চুলের ফিতাও ফেলে রেখে গিয়েছিলে। রেশমা চোখ তুলে তাকাল। লোকটির কাণ্ডকারখানা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। এই লোক তার কাছে কী চায়। খারাপ মেয়েদের নিয়ে নানান ধরনের মজা করতে লোকজন ভালবাসে। এও কি মজা করছে? লোকটা জানে না যে ইচ্ছে করলেই রেশমাও লোকটাকে নিয়ে মজা করতে পারে। না রেশমা পারে না। টেপী পারে। টেপী নানান ধরনের মজা করে। কিন্তু এখন সে টেপী না, সে এখন রেশমা। রেশমা মোটামুটিভাবে ভদ্র মেয়ে। আর মিতু কেমন মেয়ে? এই ভদ্রলোক জানেন না মিতু কেমন মেয়ে। শুধু মবিন ভাই জানেন।

এই লোকটার সামনে সে কি কিছুক্ষণের জন্যে মিতু হবে? লোকটা তাকে চমকে দেয়ার চেষ্টা করছে। নানান ধরনের চশমা পরে, নানানভাবে তাকাচ্ছে। চুলের ফিতার প্রসঙ্গ

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তুলেছে–তার মানে চুলের ফিতা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। রেশমা সহজ হয়ে বসল। মিষ্টি করে হাসল, একটু ঝুঁকে এসে বলল, আপনি কি আমার চুলের ফিতা নিয়ে এসেছেন?

হ্যাঁ।

চুলের ফিতা ফেরত দেবার দরকার ছিল না। চুলের ফিতা আমি ইচ্ছা করে রেখে এসেছিলাম।

কেন?

উপহার। একটা খারাপ মেয়েরও তো উপহার দেবার ইচ্ছা হতে পারে। পারে না?

হুঁ পারে। কাজেই তুমি বলতে চোচ্ছ যে আমি ঐ ফিতা রেখে দিতে পারি?

হ্যাঁ। পারেন।

তুমি কথা তো খুব গুছিয়ে বলছি।

নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশি। নানান রকমের কথা বলা শিখি।

আমার সঙ্গে তো বেশ কিছু সময় ছিলো। আমার কাছ থেকে কী শিখেছ?

আপনার কাছ থেকে শিখেছি মানুষকে কী করে ভয় দেখাতে হয়। আপনার কর্মচারীরা নিশ্চয়ই আপনাকে অসম্ভব ভয় পায়।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

হ্যাঁ পায়।

আপনার স্ত্রীও খুব ভয় পান তাই না?

মনে হয় পায়। সে রাতে তুমি ভয় পেয়েছিলে, এখন তো মনে হয় পাচ্ছ না।

না এখন পাচ্ছি না।

পাচ্ছ না কেন?

আমার যা মনে আসছে সেটা যদি বলে ফেলি আপনি রাগ করবেন না তো?

বল, রাগ করব না।

আপনাকে ভয় পাওয়ার মতো প্রচুর লোকজন আপনি চারদিকে জড়ো করে রেখেছেন, কিন্তু আপনার কথা বলার লোক নেই। যে জন্যে আপনার লোকজন আমার মতো মেয়েদের খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসে।

আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ থেকে তোমার এই ধারণা হয়েছে?

জ্বি। অনেকের সঙ্গে মিশেছে তো। মানুষের অনেক কিছু চট করে ধরে ফেলতে পারি।

তোমার জীবনের পরিকল্পনা কী?

কোনো পরিকল্পনা নেই।

সে কী! কোনো পরিকল্পনা নেই?

না।

বিয়ে করে সংসারী হবার পরিকল্পনাও নেই?

রেশমা চুপ করে রইল। মোবারক সাহেব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ছবির জগতের সঙ্গে যুক্ত আছ। তোমার কি ইচ্ছে করে না কোনো একটা ছবির নায়িকা হবে? সুপারস্টার হবে? ইচ্ছে করে?

রেশমার খুব ইচ্ছা করে। মিতুর করে না।

বুঝতে পারছি না।

বাবা আমার নাম রেখেছিলেন মিতু। আমার ছবির নাম রেশমা। আর রাতে যখন আপনাদের মতো মানুষদের কাছে যাই তখন আমি টেপী।

তোমাকে আমি কোন নামে ডাকব?

টেপী নামে ডাকবেন। টেপী নামটা খুব খারাপ লাগলে রেশমা ডাকবেন।

মিতু ডাকা যাবে না?

না। আপনি টেপীকে চেনেন। মিতুকে চেনেন না।

চা খাবে?

না।

খাও, চা খাও।

মোবারক সাহেব ইন্টারকমে চা দিতে বললেন। চোখ থেকে চশমা খুলে ফেললেন। বেশিক্ষণ তিনি চোখে চশমা রাখতে পারেন না। মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হয়। তিনি চোখের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছেন।

ডাক্তারের ধারণা–চশমার জন্যে চোখে যন্ত্রণা হবার কোনো কারণ নেই। ব্যাপারটা মনস্তাত্ত্বিক। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে এক ফাঁকে কথা বলতে হবে।

মোবারক সাহেব চশমা ড্রয়ারে রাখলেন। সেখান থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালেন। এটি দিনের প্রথম সিগারেট। প্রথম সিগারেট খেতে ভালো লাগে না। দ্বিতীয়টি ভালো লাগে। তিনি ঠিক করে ফেললেন, মেয়েটি থাকতে থাকতেই দ্বিতীয় সিগারেট ধরবেন। কফির সঙ্গে সিগারেট–ভালো লাগবে। মোবারক সাহেব খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। খুব পছন্দ হয়েছে। তোমাকে চমৎকার কোনো গিফট আমি দিতে চাই। কী গিফট পেলে তুমি খুশি হবে বল?

যা চাই তাই দেবেন?

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

দিয়ে ফেলতেও পারি। পরীক্ষা করে দেখ।

রেশমা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি কারো কাছ থেকে গিফট নেই না।

তুমি তো ঠিক কথা বললে না টেপী। তুমিও গিফট নাও। মবিন বলে এক ভদ্রলোক তোমাকে গিফট দেন না?

রেশমা বিস্মিত হয়ে বলল, আপনি সব খবর জানেন?

হ্যাঁ।

কেন?

পরে এক সময় বলা যাবে।

আজ বলবেন না?

না। একটা বেজে গেছে। একটার সময় আমার অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

স্যার আমি যাই।

আচ্ছা যাও। কোথায় যাবে নিচে গিয়ে বল গাড়ি তোমাকে পৌঁছে দেবে।

গাড়ি লাগবে না।

মোবারক সাহেব সাধারণত আধকাপের বেশি কফি খান না। আজ পুরোকাপ শেষ করলেন। কয়েকটা জরুরি টেলিফোন কল সারলেন। তবে কোথাও খুব মন বসাতে পারলেন না। ইনক্যামট্যাক্স লইয়ারকে এগারটায় আসতে বলেছিলেন। সে এসেছে, নিচে অপেক্ষা করছে–তার সঙ্গে বসতে ইচ্ছা করছে না। তাকে চলে যেতে বলতেও মন সায় দিচ্ছে না। অস্থির ভাবটা হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাব–ইনক্যামট্যাক্স লইয়ারের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করবে। সে চলে গেলে হয় কী করে। অপেক্ষা করুক। টেবিলের উপর সেক্রেটারির হাতে লেখা নোট পড়ে আছে। তাকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে নোটগুলো লেখা। দু'টা পয়েন্টে লাল স্টার মার্ক দেয়া।

১. শিক্ষামন্ত্রী আফসারউদ্দিন খাঁ দু'বার টেলিফোন করেছেন। তিনি দু'টা পর্যন্ত দপ্তরে আছেন।
২. গুলশান থেকে আম্মা টেলিফোন করেছেন। খুব জরুরি খবর আছে।
৩. চেম্বার অব কমার্সের মিটিং সোনারগাঁ হোটেলের বলরুম—সন্ধ্যা ৭টায়।
৪. বিথোভেনের স্মরণে জার্মান দূতাবাসে ককটেল পার্টি—সন্ধ্যা ৭টায়।

এক এবং তিন নম্বর আইটেমে লাল স্টার মার্ক দেয়া।

দু' নম্বর আইটেম মোটেই জরুরি নয়। তারপরেও মোবারক সাহেব পিএকে বললেন তার স্ত্রীকে লাইনে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে লাইন পাওয়া গেল।

হ্যালো রেহানা! জরুরি কী খবর যেন দেবে বলেছিলে।

তোমাকে তো টেলিফোন করে করে আমি হয়রান হয়ে গেলাম। কখনোই লাইন দেয় না। তোমার সেক্রেটারির দল কি ইচ্ছা করে আমাকে এভায়েড করে?

ওদের দোষ নেই–মিটিঙে ছিলাম। জরুরি খবরটা কি বল?

তুমি যে স্বপ্নতথ্যের দু'টা বই এনেছ, দু'টা বই সম্পূর্ণ দু'রকম। একটাতে লেখা হাতি স্বপ্নে দেখলে ধন লাভ হয়। আরেকটায় লেখা হাতি স্বপ্ন দেখা বিপদের পূর্বাভাস। সম্পূর্ণ উলটা না?

তা তো বটেই।

এখন আমি কোনটা বিশ্বাস করব?

যেটা ভালো সেটা বিশ্বাস করাই তো নিরাপদ। তুমি কি হাতি স্বপ্নে দেখেছি?

না।

তাহলে হাতি দেখা নিয়ে মাথা ঘামোচ্ছ কেন? একটা বইয়ের সঙ্গে অন্যটা মিলিয়ে দেখছি–কিছু করার নেই তো... যতই ঘাটছি ততই অবাক হচ্ছি। অবশ্যি কিছু কিছু জায়গায় দু'টা বইয়ের একই অর্থ, যেমন ধর–পানি স্বপ্নে দেখলে অসুখবিসুখ হবে।

ও আচ্ছা।

আমি করছি কি যে সব স্বপ্নের অর্থ দু'টা বইয়ে একই লেখা সেগুলো সবুজ কালি দিয়ে দাগাচ্ছি।

দাগাদাগির কাজ তো সাধারণত লাল কালি দিয়ে করা হয়, তুমি সবুজ কালি ব্যবহার করছ কেন?

আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও এক সেকেন্ড খুব একটা জরুরি কথা, পরে বলতে ভুলে যাব– সিমির যমজ মেয়ে হয়েছে। আমি হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম–খুব সুন্দর হয়েছে।

সিমিকে মোবারক সাহেব চিনতে পারলেন না, তারপরেও যথেষ্ট উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, সিমি ভালো আছে তো?

হ্যাঁ ভালো। যমজ মেয়ে দেখে একটু মন খারাপ করেছে।

মন খারাপের কী আছে?

আগে আরো দু'টা মেয়ে আছে এই জন্যে একটু মন খারাপ।

ও আচ্ছা, আগেও তো দু'টা মেয়ে আছে–ভুলে গিয়েছিলাম। রেহানা শোন, একটু পরে তোমাকে আবার টেলিফোন করব। ইনক্যামট্যাক্সের এক উকিল এসেছে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।

মোবারক সাহেব রেহানাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলেন না। টেলিফোন নামিয়ে রেখে লাল কালি দিয়ে তাঁর সামনে রাখা নোটের দু'নম্বর আইটেম কেটে দিলেন। পিএকে বললেন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে।

শিক্ষামন্ত্রী আফসারউদ্দিন খাঁ অত্যন্ত আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, মোবারক সাহেব নাকি? আরে ভাই আপনাকে তো পাওয়াই যায় না।

খুবই ব্যস্ততার ভেতর আছি স্যার।

ব্যস্ত মানুষ ব্যস্ততা থাকবে না? তাই বলে একেবারে যোগাযোগ বাদ দিবেন। এটা কেমন কথা!

এই তো স্যার যোগাযোগ করলাম–এখন বলুন কী করতে পারি।

খেদমত আপনি কী করবেন? খেদমত করব আমরা। আমরা হলাম জনগণের খেদমতগার।

গরিবকে স্মরণ করেছেন কী জন্যে স্যার বলুন।

আমার মেজ মেয়ের বিয়ে।

বাহ্ বাহ্ খুব ভালো সংবাদ।

ভালো সংবাদ মন্দ সংবাদ জানি না। মেয়ে যখন আছে পার তো করতে হবে–আপনার ছেলেপুলে নাই–ঝাড়া হাত-পা মানুষ, ছেলেপুলের বিয়েশাদির যন্ত্রণা আপনাকে পোহাতে হচ্ছে না। You are a lucky man.

মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে যদি আপনার কোনো কাজে লাগি বলতে লজ্জা করবেন না।

আরে লজ্জা করব কেন? আপনি তো বাইরের কেউ না। আপনার ভাবি কাল রাতেও বলছে–মোবারক সাহেবকে কিন্তু টেলিফোনে দাওয়াত দেবে না। নিজে গিয়ে দাওয়াত দেবে।

আপনি কিন্তু স্যার ভাবির কথা শোনেন নি, টেলিফোনে দাওয়াত সেরেছেন।

আরো ছিঃ ছিঃ কী যে বলেন! বিয়ের খবরটা ইন অ্যাডভান্স আপনাকে দিলাম–দাওয়াতের তো কার্ডই ছাপা হয় নি।

স্যার বিয়েটা কবে?

এখানো দেরি আছে। ২৫ তারিখ শুক্রবার, সেনাকুঞ্জে।

আপনার মেয়েকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখবেন সে চাচার কাছ থেকে কী উপহার চায়। নাকি আমি নিজেই জিজ্ঞেস করব?

সর্বনাশ ঐ কাজ করতে যাবেন না। সে গাড়ি চেয়ে বসবে। ঐ দিন সে তার মাকে বলছিল মোবারক চাচার অভ্যাস উপহার দেয়ার আগে জিজ্ঞেস করা কী উপহার চাই। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে আমি বলব–লাল রঙের টয়োটা সিভান।

লাল রঙের টয়োটা সিভানের শখ?

আরে ভাই ছিঃ ছিঃ আমার এই পাগলি মেয়ের কথার কোনো গুরুত্ব দেবেন না। যদি কিছু দিতে হয় একটা কোরান শরিফ দেবেন। মোবারক সাহেব।

জ্বি।

মেয়ের লাল গাড়ির শখের কথা আপনাকে বলা উচিত হয় নি। আপনি তো আবার ছেলেমেয়ের শখের অত্যধিক গুরুত্ব দেন–ভাই শুনুন আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা– আল্লাহপাকের পাক কালামের চেয়ে ভালো গিফট কিছুই হয় না। এখন এর কারণে আপনারা আমাকে প্রাচীনপন্থী মনে করেন বা না করেন–কিছু যায় আসে না...

আফসারউদ্দিন খাঁ সাহেবও রেহানার মতো দীর্ঘ সময় কথা বললেন। মোবারক সাহেব ছাড়া পেলেন আধঘণ্টা পর। পিএকে বললেন–নোট করে রাখুন মন্ত্রী আফসারউদিনের মেয়ের বিয়ে ২৫ তারিখ। সেনাকুঞ্জে। বিয়ের টাইমটা জেনে নেবেন। গিফট আইটেম– একটা কোরান শরিফ সুন্দর করে র‍্যাপিং পেপারে মোড়া।

কোরআন শরিফ?

হ্যাঁ।

মোবারক সাহেব মনে মনে হাসলেন। মন্ত্রী আফসারউদিনের সঙ্গে এই রসিকতা করা যায়। সে নিশ্চিত ধরে নিয়েছে লাল রঙের টয়োটা সিভান আসছে। সে জানে না। এই জগতের কোনো কিছুই নিশ্চিতভাবে নেয়া ঠিক না। জগতের কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে চিঠি

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে চিঠি এসেছে। রফিক লিখছে–সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তার শরীর খারাপ। মা যেন একবার তাকে দেখতে যায়।

শাহেদাকে সেই চিঠি দেখানো হয়েছে। তিনি কিছু বলেন নি। ঝুমুর বলল, তুমি কি দেখতে যাবে? শাহেদা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছেন। সেই প্রশ্নেরও জবাব দেন নি। ঝুমুর বলল, তুমি যদি যেতে চাও, আপাকে বলতে হবে। দেখা করতে চাইলেই তো দেখা হয় না। ঘুস-টুস খাওয়াতে হয়। আগে থেকে না জানালে আপা ব্যবস্থা করবে কীভাবে? শাহেদা তারপরেও জবাব দিলেন না। ঝুমুর বলল, তুমি কি আপার সঙ্গে কথা বলবে? আপা ঘরেই আছে। আজ সে কোথাও যাবে না।

তুই স্কুলে যা। তোকে এত কথা বলতে হবে না।

আমি আজ স্কুলে যাব না। আপার সঙ্গে সারাদিন গল্প করব।

কর যা ইচ্ছা।

মিতু দরজা ভিজিয়ে শুয়ে আছে। ছোট বোনের সঙ্গে গল্প করার ব্যাপারে তার তেমন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। ঝুমুর কয়েকবার কাছে গেল, বিছানার পাশে বসল। মিতু তাকিয়ে দেখল– কিছু বলল না

আপা মাথা বিলি দিয়ে দেব?

মিতু না-সূচক মাথা নাড়ল।

শুয়ে আছ কেন? শরীর খারাপ লাগছে?

শরীর খারাপ লাগছে না। শরীর ভালোই, আরাম করছি। বিকেল পর্যন্ত শুয়ে থাকব।

তারপর?

বিকেলে বেরুব।

ঝুমুর আপার চোখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, রাতে শুটিং আছে?

হুঁ।

সারারাত শুটিং চলবে?

মিতু হাঁ-সূচক মাথা নেড়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে পাশ ফিরল। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, ঝুমুর তুই কি আমার একটা কাজ করে দিবি?

অবশ্যই দেব।

একটা চিরুনি কিনে আনবি। সুন্দর একটা চিরুনি।

চিরুনি দিয়ে কী করবে?

চিরুনি দিয়ে মানুষ কী করে।

তোমার তো চিরুনি আছে এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।

মবিন ভাইকে দেব। ঐ দিন দেখলাম ওর চিরুনি নেই।

আমিও তাই আন্দাজ করছিলাম।

জানালার পর্দা টেনে দে তো।

ঝুমুর উঠে পড়ল। জানালার পর্দা টেনে দিতে বলার অর্থ–আমি এখন ঘুমুব। আপা তাকে খুব ভদ্রভাবে বলছে, তুই উঠে চলে যা।

আপা তুমি চা খাবে? চা বানিয়ে আনব?

না।

ঝুমুর ইতস্তত করে বলল, তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম। আপা, জরুরি কথা।

বল।

আমি এই বছর পরীক্ষা দেব না। সামনের বছর দেব।

মিতু কিছু বলছে না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আপা আমি একদম পড়াশোনা করতে পারছি না। বই নিয়ে বসি অন্য কথা ভাবি। সামনের বছর আমি খুব মন দিয়ে পড়ব। পরীক্ষায় দেখবে খুব ভালো করব। ঠিক আছে আপা?

মিতু চোখ না মেলেই বলল, আমার হ্যান্ডব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে একটা চিরুনি কিনে না।

এখনি যাব?

এক সময় গেলেই হবে।

পরীক্ষার ব্যাপারে তো তুমি কিছু বললে না।

মিতু চাপা গলায় বলল, পরীক্ষা দেয়া না-দেয়া তোর ব্যাপার। আমার আর বলার কী আছে?

রাগ করছ না তো?

না। তুই এখন ঘর থেকে যা।

ঝুমুর চিরুনি কিনতে বের হয়ে গেল। তখন ঘরে ঢুকলেন শাহেদা। তাঁর হাতে চায়ের কাপ। পিরিচে দু'টা বিসকিট। মিতু বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, চা খাব না। মা। তুমি খেয়ে ফেল। বিসকিটও খাব না।

সকালে নাশতাও খাস নি। খিদে জমাচ্ছি। দুপুরে এক গামলা ভাত খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমুব।

শাহেদা মেয়ের পাশে বসে চা খাচ্ছেন। মিতু বলল, বিসকিট খাও মা। তোমার খাওয়া দেখি।

খাওয়া দেখার কী আছে?

অনেক কিছুই আছে। পৃথিবীর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো খাওয়া। সেই খাওয়া দেখাটা তুচ্ছ করার মতো কিছু না।

বাড়িওয়ালা বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছে, শুনেছিস?

হুঁ। ঝুমুরের কাছে শুনলাম।

বাড়ি দেখেছিস?

না।

এক তারিখের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে তো।

বললেই তো বাড়ি ছেড়ে দেয়া যায় না।

আমি বলেছি ছেড়ে দেব।

বলেছ, ভালো করেছ। আমি বুঝিয়ে বলব।

আমি এখানে থাকতে চাই না। লোকজন আজেবাজে কথা তোর নামে ছড়াচ্ছে।

যেখানে যাবে সেখানেও তো ছড়াবে।

শাহেদা চুপ করে গেলেন। চায়ে বিসকিট ভিজিয়ে তিনি বিসকিট খাচ্ছেন। মিতু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

আজ রান্না কী মা?

নলা মাছ নিয়ে এসেছিল। রাতে খাবি। দুপুরে ডাল ভাত।

দুপুরেই রাঁধ মা। আরাম করে খাই। রাতে আমি থাকব না। রাতে শুটিং আছে।

আজ শুক্রবারে। শুক্রবার তো শুটিং থাকে না।

আজ আছে।

ঐ দিন না বললি ছবির কাজ শেষ হয়ে গেছে?

প্যাঁচওয়ার্ক বাকি আছে। কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেগুলো আবার করা হবে।

রাতে ফিরবি না?

না।

শাহেদা মুখ শক্ত করে বসে আছেন। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। চায়ের কাপে তিনি এখন আর চুমুক দিচ্ছেন না। বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। মিতু শঙ্কিত গলায় বলল, কিছু বলছ মা?

শাহেদা ক্ষীণ স্বরে বললেন, তোর বাবাকে কাল রাতে স্বপ্নে দেখেছি। মুখটা খুব মলিন। তিনি বললেন–তুমি এত কষ্ট করছ, কেন? কষ্ট করার দরকার কি? এই টিনটা রাখ, এখানে ইঁদুর মারা বিষ আছে। তুমি নিজে খাও–মেয়ে দু'টাকে খাওয়াও, দেখবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এই বলে তিনি একটা টিনের কৌটা আমার হাতে দিলেন।

রাতদিন এইসব ভাব এই জন্যেই স্বপ্নে দেখেছি।

তোর বাবা কথাটা কিন্তু ভুল বলে নি।

মিতু হাসছে। শাহেদা বললেন, হাসছিস কেন?

এমনি হাসছি। তুমি ঝাল ঝাল করে নলা মাছ রাঁধ তো মা। ইঁদুর মারা বিষ আবার মিশিয়ে দিও না। আমার এখন মরার কোনো রকম ইচ্ছা নেই।

শাহেদা নড়লেন না। বসেই রইলেন। মিতু বলল, এক কাজ করলে কেমন হয় মা, আজ আমি রান্না করি, রান্না করে তোমাকে খাওয়াই। তুমি চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম কর। আরেকটা

কথা শোন, সংসারের সমস্যা নিয়ে তুমি মোটেও ভাববে না। আমি কী করব তোমাকে বলি, ঝুমুরকে বিয়ে দিয়ে দেব। ওর আর পড়াশোনা হবে না। ওর পড়াশোনায় মন নেই। মোটামুটি ধরনের একটা ছেলে দেখে ওর বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। ওর চেহারা ভালো– ছেলে পাওয়া কোনো সমস্যা হবে না। তোমাকে আমি বলি নি। এর মধ্যেই একটা সম্বন্ধ এসেছে। ছেলেটা ব্যাংকে চাকরি করে। ছোট চাকরি। তবে সংসারের দায়দায়িত্ব নেই। দু'জন মিলে ওরা সুখেই থাকবে। মবিন ভাই এর মধ্যে একটা চাকরি পেয়ে যাবে। তখন আমি বিয়ে করব। তুমি থাকবে আমার সংসারে। মাঝে মাঝে ঝুমুরকে গিয়ে দেখে আসবে। এখন তুমি আসি তো আমার সঙ্গে, রান্নার সময় যদি ভুল-টুল করি তুমি ধরিয়ে দেবে। আরেকটা কথা মা–এর পরে যদি কোনোদিন স্বপ্নে বাবাকে দেখ তোমার কাছে ইঁদুর মারা বিষ গছিয়ে দিতে চাচ্ছে তাহলে তুমি তাঁকে কিন্তু কঠিন ধমক দেবে।

মিতু বিছানা থেকে নামল। তার মাকে হাত ধরে তুলল। মিতুর মুখ হাসি হাসি।

শাহেদা বললেন, ঝুমুরকে বিয়ে করতে চাচ্ছে যে তার নাম কি?

আমানুল্লাহ্। অগ্রণী ব্যাংকে কাজ করে।

কী রকম কাজ? দারোয়ান টারোয়ান না তো?

না দারোয়ান না, ক্লার্ক।

তোকে সরাসরি বলেছে?

আমাকে বলে নি, মবিন ভাইকে বলেছে।

ওকে কেন বলবে? ও কে? তার কিছু বলার থাকলে সরাসরি তোকে কিংবা আমাকে বলবে। ছেলেটার দেশ কোথায়?

আমি মা কিছুই জানি না। আমি খোঁজ নিয়ে বলব।

কবে খোঁজ নিবি?

আজই খোঁজ নেব। এফডিসিতে যাবার আগে মবিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে তারপর যাব।

মবিন শুয়ে ছিল। মিতুকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসল। অবাক হয়ে বলল, আরো তুমি।

মিতু বলল, অবেলায় শুয়ে আছ কেন?

বেকার মানুষের আবার বেলা, অবেলা, কালবেলা? তুমি এই সময় যে?

এটা কি নিষিদ্ধ সময়?

না নিষিদ্ধ হবে কেন? এস ভেতরে এস? আমার চিরুনি এনেছ?

হুঁ।

সিগারেট?

না। সিগারেট আনা হয় নি।

কতক্ষণ থাকবে?

রাত আটটা পর্যন্ত থাকতে পারি। কিন্তু তোমার তো সময় হবে না।

সময় হবে না তোমাকে কে বলল?

সন্ধ্যাবেলায় তোমার টিউশানি আছে না?

ছিল–এখন নেই। সন্ধ্যাটায় আমি এখন স্বাধীন। গতকাল সন্ধ্যায় কী করেছি। জান, একটা সিনেমা দেখে ফেললাম, 'জানি দুশমন'। আশায় আশায় গিয়েছিলাম, হয়তো তোমাকে দেখব। জানি দুশমন ছবিতে তুমি কাজ কর নি। তাই না?

না!

টেপী কি করেছে? সুন্দর মতো একটা এক্সট্রা মেয়ে দেখলাম। নায়িকার সঙ্গে নদীতে পানি আনতে গেল।

টেপী ঐ ছবিতে কাজ করেছে কিনা বলতে পারছি না।

দেখা হলে জিজ্ঞেস কোরো তো। ওর সঙ্গে এখন দেখা হয় না?

কম হয়।

ছবির ঐ মেয়েটাকে দেখে মনে হলো, এ নিশ্চয়ই টেপী। মেয়েটার মাথা ভর্তি চুল, জোড়া ভুরু।

জোড়া ভুরু! তাহলে টেপী না। টেপীর জোড়া ভুরু না।

মবিন আগ্রহের সঙ্গে বলল, টেপীর কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। ওকে আমার দেখার খুব ইচ্ছা। একদিন তোমার সঙ্গে এফডিসিতে যাব। মেয়েটাকে দেখে আসব।

আচ্ছা।

ও আছে কেমন?

ভালোই আছে। দারুণ এক বড়োলোকের সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। সেদিন এফডিসি থেকে গাড়ি পাঠিয়ে তাকে নিয়ে গেল।

বল কী! সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

টেপী নিশ্চয়ই খুব খুশি।

না খুশি না। ও দেখলাম খুব ভয়ে ভয়ে গাড়িতে উঠল। মুখটা কান্নাকান্না।

কেন বল তো?

বড়লোকেরা গাড়ি পাঠিয়ে তো আর গল্প করার জন্যে নিয়ে যায় না, প্রেম করার জন্যেও নিয়ে যায় না–অন্য কারণে নিয়ে যায়। সবাই সেটা জানে। কাজেই সবার চোখের উপর দিয়ে বিরাট এক গাড়িতে করে যাওয়া খুব লজ্জার ব্যাপার না?

অস্বস্তির ব্যাপার তো বটেই। দারুণ বড়লোকদের জন্যে দারুণ বড়লোক মেয়ে পাওয়া সমস্যা না–তারা পথেঘাটের মেয়েদের গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবে কেন?

মিতু হাই তুলতে তুলতে বলল, পথের মেয়েদের সঙ্গে যত সহজ হওয়া যায় অন্যদের সঙ্গে তো তত সহজ হওয়া যায় না। পথের মেয়ের আলাদা আনন্দ আলাদা থ্রিল। যাই হোক টেপীকে নিয়ে আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। অন্য কিছু নিয়ে কথা বল।

কী কথা শুনতে চাও?

যা ইচ্ছা বল। তার আগে কাছে আস তো আমি তোমার চুল আঁচড়ে দিই। নাকি আমি চুল আঁচড়ে দিলে লজ্জা লাগবে?

না লজ্জা লাগবে না।

মবিন এগিয়ে এল। খুব কাছে এল না। মাথা এগিয়ে দিল। যেন গায়ের সঙ্গে গা লেগে গেলে মস্ত বড়ো অন্যায় হয়ে যাবে। মিতু চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, তুমি কি ঝুমুরের জন্যে একটা ছেলে যোগাড় করে দেবে? আমি ওর বিয়ে দিয়ে দেব।

বাচ্চা মেয়ে বিয়ে দেবে কেন?

ওরা এখনই বিয়ে হওয়া ভালো। বিয়ে হলে মা মানসিক শান্তি পাবেন। মা ওকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করেন। মা'কে আমি অবশ্যি বলেছি আমানুল্লাহ নামের এক ছেলে ঝুমুরকে বিয়ে করতে চায়। এতেই মা খুশি।

আমানুল্লাহ কে?

মিতু হাসতে হাসতে বলল, আমানুল্লাহ কেউ না। আমার বানানো এক নাম। মা'কে খুশি করার জন্যে গল্পটা তৈরি করা।

তিনি খুশি হয়েছেন?

হ্যাঁ খুশি হয়েছেন। অভিনয় তো আমি ভালো পারি–যাই বলি এত সুন্দর করে বলি, সবাই বিশ্বাস করে।

আমার বেলাতেও তাই করা?

না।

কখনো না?

মাঝে মাঝে করি। যখন করি তখন খুব খারাপ লাগে।

মবিন হাসছে। মিতুও হাসছে। মিতু বলল, চুল আঁচড়ানোটা ভালো হয় নি। এস আবার আঁচড়ে দিই। এরকম শক্ত হয়ে থাকবে না–আমার শরীরে কুষ্ঠ হয় নি যে ছোঁয়া লাগলে তোমার ক্ষতি হবে।

মবিন হড়বড়িয়ে বলল, কী যে তুমি বল!

ঠিকই বলি–তুমি আমার সঙ্গে সব সময় এমন ভাব করা যেন আমি তোমার ছাত্রী। তুমি আমাকে পড়াচ্ছ এবং আমার মা একটু দূরে বসে পড়ানো কেমন হচ্ছে লক্ষ করছেন।

মবিন হাসল।

মিতু কঠিন গলায় বলল, আমি সামান্য এক্সট্রা মেয়ে হতে পারি। কিন্তু আমার হাত দু'টা সুন্দর। সুন্দর না? দেখা কী সুন্দর লম্বা লম্বা আঙুল!

সে তো সব সময়ই দেখছি।

হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখ। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলে তোমার মান যাবে?

মবিন বিস্মিত হয়ে বলল, আজ তোমার কী হয়েছে বল তো?

কিছু হয় নি। হবার মধ্যে যা হয়েছে তা হলো তোমার দেয়া শাড়িটা পরেছি। বেগুনি রং আমার অসহ্য কিন্তু শাড়িটা পরার পর নিজেকে এত সুন্দর লাগছে কেন কে জানে। আয়নায় নিজেকে দেখে চমকে উঠেছি। তোমার কাছে কি আমাকে সুন্দর লাগছে না?

লাগছে।

সত্যি লাগছে, না আমাকে খুশি করার জন্যে বলছ?

সত্যি লাগছে।

তাহলে তোমার আজ ভয়ঙ্কর বিপদ।

তার মানে?

আমি আজ কোথাও যাব না। সারারাত গল্প করব। যদি ঘুম পায় তোমার এই খাটে তোমার পাশে শুয়ে থাকব। তোমার কি একটাই বালিশ?

মবিন তাকিয়ে আছে। তার চোখে পলক পড়ছে না। মিতু বলল, এভাবে তাকিয়ে থাকবে না। আমি মন ঠিক করে এসেছি।

তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।

মিতু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তাই বোধহয়। ক'টা বাজে দেখ তো?

সাতটা।

তুমি ওঠ, স্যান্ডেল পরে নাও। আমাকে বাসে তুলে দেবে। রাতে আমার শুটিং আছে। এতক্ষণ ঠাট্টা করছিলাম। আমি কী সুন্দর অভিনয় পারি দেখলে তো? আমার কথা বিশ্বাস করে ভয়ে ঘেমে-টেমে একেবারে অস্থির। এত ভয় পাচ্ছিলে কেন?

না মানে, লোক জানাজানি হলে তোমার অসম্মান। আজ রাতে তোমার শুটিং?

হুঁ। কিছু প্যাঁচওয়ার্ক দরকার পড়ে গেল। নরমাল টাইমে শিডিউল পাচ্ছিল না। আজই শেষ।

শেষ হলেই ভালো। সারারাত জেগে কাজ করা কী বিশ্রী ব্যাপার!

সবাই সুশ্রী ব্যাপার করবে তা তো হয় না। কাউকে কাউকে বিশ্রী ব্যাপারও করতে হয়। আমরা কিন্তু রিকশা নেব না। হেঁটে হেঁটে বাসস্টেশন পর্যন্ত যাব। আমার হাঁটতে ইচ্ছা করছে।

অনেকখানি রাস্তা তো।

অনেকখানি রাস্তাই তোমার সঙ্গে হেঁটে পার হব। তুমি আমার হাত ধরে থাকবে। অন্ধকার রাস্তা–কেউ দেখবে না।

মনিব বলল, চল তোমাকে এফডিসি পর্যন্ত দিয়ে আসি।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

কোনো দরকার নেই। আমি একাই যাব।

আমি সঙ্গে গেলে অসুবিধা আছে?

আছে। এক্সট্রাদের সঙ্গে যে সব পুরুষ মানুষ থাকে তাদের দালাল দালাল মনে হয়। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে সবাই আড়চোখে তোমাকে দেখলে, আমার অসহ্য লাগবে। আমাদের বিয়ের পর তোমাকে নিয়ে যাব। পরিচিত সবাইকে ক্যান্টিনে চা-টা খাইয়ে দেব। তুমি কী বল?

সেটা মন্দ না।

তারা বাসস্টেশনে চলে এসেছে। ঢাকা যাবার বাস আসছে দেখা যাচ্ছে। মিতু বিষন্ন ভঙ্গিতে বলল, এতটা রাস্তা আমরা পাশাপাশি হেঁটে এলাম, তুমি কিন্তু একবারও আমার হাত ধর নি।

ও সরি। দেখি তোমার হাত।

থাক দেখতে হবে না। বাস চলে এসেছে।

দিলদার খাঁ দরজা খুলেই বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, এতক্ষণে। ক'টা বাজে জান?

রেশমা লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, বাস পথে জ্যামের মধ্য পড়েছে। অ্যাকসিডেন্টের জন্যে এয়ারপোর্ট পুরা দুঘন্টা বন্ধ। কী করব বলুন।

রাত বাজে এগারটা, পার্টি এতক্ষণ তোমার জন্যে বসে থাকবে? আমার নিজেরও একটা বদনাম হয়ে গেল। কথা রাখতে পারলাম না।

সরি দিলদার ভাই।

এখন সরি বলে লাভ কী? রাত ন'টা পর্যন্ত পার্টিকে ধরে রেখেছি। তারপর বাধ্য হয়ে অন্য ব্যবস্থা করেছি। হুট করে তো কাউকে পাওয়া যায় না। পার্টির পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে।

রেশমা বলল, আমি এখন কী করব?

কী আর করবে? বাসায় চলে যাবে।

এত রাতে বাসায় যাব না। ভোরবেলা যাব। রাতটা আপনার বাসায় থেকে যাই।

দিলদার বিরক্ত গলায় বলল, আরো সর্বনাশ! বাসায় থাকতেই পারবে না। তোমার ভাবি এইসব ব্যাপারে অসম্ভব স্ট্রিক্ট।

বসার ঘরের সোফায় শুয়ে থাকব।

অসম্ভব। বসার ঘরের সোফা কেন, বারান্দায় শুয়ে থাকলেও সে ঝাঁটাপেটা করবে।

রেশমা বলল, ঠিক আছে থাকব না। ঘরে ঢুকতে দিন। ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা হয়েছে। এক গ্লাস পানি খাব–তারপর ভেবে ঠিক করব কী করা যায়।

দিলদার খাঁ নিতান্ত অনিচ্ছায় দরজা থেকে সরে দাঁড়াল।

পুরনো অসুখটা কি আবার তাঁকে ধরেছে? সেই ভয়াবহ অসুখ? যে অসুখ গভীর গোপনে লুকিয়ে থাকে, হঠাৎ বের হয়। যখন বের হয় তখন সমগ্র চিন্তা-চেতনা আচ্ছান্ন করে দেয়।

মোবারক সাহেবের চিন্তা-চেতনা গুলিয়ে যাচ্ছে। তিনি বসে আছেন তার এল সি থ্রি পারসোনাল কম্পিউটারের সামনে। পর্দায় দাবার বোর্ড। এবারের চাল তার দেয়ার কথা। পর্দায় ফ্ল্যাসিং সাইন উঠছে। সুন্দর চাল তাঁর আছে। মন্ত্রীর সামনের বড়ে এক ঘর এগিয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষের নাইটকে বেকায়দায় ফেলা। তিনি চাল দিচ্ছেন না। মূর্তির মতো বসে আছেন। তাঁর ভেতর থেকে একজন কেউ বলছে, অর্থহীন, এই চাল দেয়া অর্থহীন। কে বলছে? তাঁর পুরনো অসুখটা বলছে?

হ্যাঁ সেই পশুটাই বলছে। কিন্তু পশুটাকে এখন আর পশু বলে মনে হচ্ছে না। পশুর গলার স্বর মধুর। প্রথম যৌবনের কিশোরী প্রেমিকার কণ্ঠস্বরের মতো। তাঁর প্রথম যৌবনে কোনো কিশোরী প্রেমিকা ছিল না। থাকলে অবশ্যই সে এরকম কণ্ঠে কথা বলত।

কণ্ঠস্বর বলল, দাবার চাল দিয়ে কী হবে?

তিনি যুক্তি দিতে চেষ্টা করলেন। ক্ষীণস্বরে বললেন, আনন্দ। খেলার আনন্দ। জয়পরাজয়ের আনন্দ।

জয়-পরাজয়ের আনন্দ সবার জন্যে নয়। এই খেলায় জয় করেও তুমি আনন্দ পাবে না। পরাজিত হয়েও তুমি আনন্দ পাবে না। একটু শুধু ক্লান্ত হবে। তুমি ক্লান্ত হবার জন্যে খেলছ?

না।

তাহলে শুধু শুধু খেলছ কেন?

খেলছি না তো আমি বসে আছি।

এভাবে কতক্ষণ বসে থাকবে?

জানি না।

অনন্তকাল বসে থাকবে?

অনন্তকাল বসে থাকব। কেন? আমি এখন উঠব। হাত-মুখ ধোব, কফি খাব, তারপর ঘুমুতে যাব।

কারো কারো জন্যে সময় থেমে যায়। তোমার জন্যে সময় থেমে গেছে। তুমি যাই কর তোমার কাছে মনে হবে তুমি অনন্তকাল ধরে করছি। সত্যি না?

হ্যাঁ সত্যি।

তুমি যখন তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বল— তোমার কাছে মনে হবে তুমি অনন্তকাল ধরে কথা বলছি। তুমি যখন হাতে কফির পেয়ালা নেবে তখন মনে হবে অনন্তকাল ধরেই কফির পেয়ালা হাতে তুমি বসে আছ।

আমি কি অভিশপ্ত?

সব মানুষই অভিশপ্ত। ওরা তা জানে না বলে ওরা হেসে খেলে জীবন ধারণ করছে। তুমি জেনে গেছ। তোমার মতো আরো অনেকেই জেনেছে। জাপানের নোবেল পুরস্কার পাওয়া সেই ঔপন্যাসিকের নাম যেন কি?

কাওয়াবাতা।

হ্যাঁ কাওয়াবাতা। তিনি যখন সব পেয়ে গেছেন তখন তিনি আত্মহত্যা করেন। এরকম উদাহরণ আরো আছে। আছে না?

আছে? কবি মায়াকোভস্কি, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে... পুশকিনকেই বা বাদ দেবে কীভাবে?

পুশকিন ডুয়েলে মারা গেছেন।

একই কথা। ব্যাপার একই। জীবন তাদের কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিল। তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন বেঁচে থাকার কোনো কারণ নেই। তুমিও বুঝে গেছ...

আমার বিশাল কর্মকাণ্ড, ব্যবসা...

তাদের কর্মকাণ্ড কি তোমার চেয়ে কম ছিল?

মৃত্যু আমাকে কী দেবে?

কিছুই দেবে না। এটা কি অনেক বড় উপহার না?

সে রকমই মনে হচ্ছে।

একটা বইয়ের শেষ পাতায় কী লেখা থাকে–দি এন্ড। সমাপ্তি। মৃত্যু তোমাকে শেষ পাতায় এনে দেবে। এটা কি আনন্দময় একটা ব্যাপার না?

হ্যাঁ। আমাকে তুমি এখন কী করতে বল?

তুমি তোমার কম্পিউটারে লেখ–The End. সুন্দর করে লেখ। কম্পিউটারের পর্দায় তিনি লিখলেন

The End.

এত ছোট করে লিখেছ কেন? বড় টাইপে লেখা। সব ক্যাপিটেল লেটারে।

তিনি লিখলেন–

THE END.

আর তখন বিশ্রী শব্দে ইন্টারকম বাজতে লাগল। তিনি ইন্টারকমের রিসিভার কানে নিলেন। ইদরিস বলল, স্যার স্লামালিকুম।

তিনি যন্ত্রের মতো বললেন, কী ব্যাপার ইদরিস?

একটা মেয়ে এসেছে স্যার। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে।

কে এসেছে?

এই বাড়িতে সে আগে একবার এসেছিল।

টেপী?

নাম বলল রেশমা।
ও আচ্ছা।
ওকে কী বলব স্যার?

মোবারক সাহেব চুপ করে রইলেন। তার ভেতরে সেই পশু কিছু বলে কিনা শুনতে চেষ্টা করলেন। কেউ কিছু বলছে না। তিনি আগ্রহের সঙ্গে বললেন, ইদরিস রেশমাকে উপরে নিয়ে এস।

জুি আচ্ছা স্যার।

রেশমা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ভয়ে ভয়ে উঠছে। সিঁড়ির মাথায় মোবারক সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। মোবারক সাহেবের মুখ হাসি হাসি।

তিনি দূর থেকে বললেন, কী ব্যাপার বল তো?

রেশমা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তাকে একটু যেন বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে। সে বলল, আমি আমার চুলের ফিতাটা ফেলে গিয়েছিলাম। নিতে এসেছি।

মোবারক সাহেবের মনে হলো, বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে। সুন্দর জবাব দিয়েছে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকলে মনের ভেতেরের পশুটাকে অনেকক্ষণের জন্যে আটকে রাখা যাবে।

তুমি কি ফিতা নিয়েই চলে যাবে?

আপনি থাকতে বললে থাকব।

দাঁড়িয়ে আছ কেন, এস! এস! মোবারক সাহেব হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। রেশম ইতস্তত করছে। মোবারক সাহেব বললেন, ধর আমার হাত ধর।

রেশমা হাত ধরল। মোবারক সাহেব বললেন–তুমি হঠাৎ করে আসায় আমি যে কী ভয়ঙ্কর খুশি হয়েছি তুমি কোনোদিনও তা জানবে না। তুমি আমার কাছে কিছু চাও। যা চাইবে তাই পাবে। এটাকে মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে ধরে নাও। বল কী চাও?

রেশমা বলল, আমি কি অন্য কারো জন্যে কিছু চাইতে পারি?

হ্যাঁ পার।

আমার একজন অতি প্রিয় মানুষ আছে। চা বাগানের একটা চাকরির তার খুব শখ। ভালো একটা চাকরি।

মোবারক সাহেব বললেন, আমার সঙ্গে আসি। আমি কম্পিউটারে তার নাম-ঠিকানা তুলে নিচ্ছি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা করব।

মোবারক সাহেব তাঁর কম্পিউটার থেকে The End লেখা মুছে ফেললেন। জরুরি লেখা ফোল্ডার ওপেন করে বললেন–
বল রেশমী, নাম বল।

রেশমা নাম বলল।

তুমি কি খেয়ে এসেছ?

জ্বি না।

আশ্চর্য! আমিও খাই নি। ইদরিসকে বলি খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। তুমি কী খেতে পছন্দ কর?

আমি সবকিছুই পছন্দ করি। আপনি কী পছন্দ করেন?

জানি না। আসলেই জানি না। মজার ব্যাপার কী জান মিতু অনেকদিন পর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি কী পছন্দ করি।—ঐ ভদ্রলোকের ঠিকানা কী বল? মেইলিং অ্যাড্রেস।

সূচিপত্র

ঝুমুরদের রান্নাঘর বারান্দায়

ঝুমুরদের রান্নাঘর বারান্দায়। করোগেটেড টিন দিয়ে বারান্দার একটা অংশ আলাদা করে রান্নাঘর। চালে কয়েক জায়গায় ফুটো আছে। বৃষ্টির সময় ফুটো দিয়ে পানি পড়ে। রাঁধতে শাহেদার খুব যন্ত্রণা হয়। শাহেদা এই মুহূর্তে যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। বড়া ভাজার জন্যে তেল চড়িয়েছেন। বৃষ্টির পানি ফুটন্ত তেলে এসে পড়ছে। ফুটন্ত তেলের ছিটা তার মুখে এসে পড়েছে। মুখের খানিকটা তো অবশ্যই পুড়েছে। শাহেদাকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। তিনি আহু উহু জাতীয় কোনো শব্দ করেন নি। তাঁর ব্যস্ততা চুলাটা নিরাপদ কোনো জায়গায় সরিয়ে নেয়ার দিকে। এই সময় ঝুমুর এসে বলল, বাড়িওয়ালা এসেছে মা।

শাহেদা বললেন, কাল সকালে এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে যেতে বল।

বাড়ি ভাড়া নিতে আসেনি মা। বাড়ি ছেড়ে দেয়ার কথা। আমরা বাড়ি ছাড়ি নি এই নিয়ে খুব চোঁচামেচি করছে।

শাহেদা নির্বিকার গলায় বললেন, করতে থাকুক।

তিনি কেরোসিনের চুলা দেয়ালের দিকে সরিয়ে দিলেন। সেখানে পানি আরো বেশি পড়ছে। ঝুমুর বলল, মা তুমি আস উনি বিশ্রী বিশ্রী সব কথা বলছেন। বাড়ির সামনে লোক জমে গেছে।

শাহেদা চুলা থেকে কড়াই নামালেন। মাথার উপর আঁচল তুলে দিলেন। ঝুমুর মা'র সঙ্গে গেল না। তার হাত-পা কাঁপছে। তার মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড হতে যাচ্ছে। এমন সময় হচ্ছে যখন আপা বাড়িতে নেই। আপা থাকলে যত ভয়ঙ্কর কাণ্ডই হোক সামাল দিতে পারত। এখন কে সামলাবে? এক ফাঁকে সে গিয়ে কি মবিন ভাইকে নিয়ে আসবে? মাঝে মাঝে একজন পুরুষ মানুষের উপস্থিতির এমন প্রয়োজন পড়ে!

শাহেদা বারান্দার খোলা দরজার পাশে দাঁড়ালেন। বাড়ির উঠানে এবং রাস্তায় এতগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে তিনি কল্পনা করেন নি। হৈচৈ শুনে এরা জড়ো হয়েছে তাও মনে হচ্ছে না। বৃষ্টি মাথায় করে এতগুলো মানুষ জড়ো হবে না। নিজামউদ্দীন সাহেব মনে হচ্ছে এদের সঙ্গে করেই এনেছেন। ফুটন্ত তেল শাহেদার থুতনির কাছে পড়েছে। জায়গাটা কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি জমে ফোঁসকা উঠে যাবে। তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। শাহেদা বললেন, কী হয়েছে?

নিজামউদ্দীনের গলা শীতল। কণ্ঠস্বরে কোনো রাগ নেই। তার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য পরিষ্কার। তিনি কথা বললেন উঁচু গলায় যাতে জড়ো হওয়া প্রতিটি মানুষ তার কথা শুনতে পায়।

কী হয়েছে আমাকে জিজ্ঞেস করেন কেন? কী হয়েছে সেটা তো আপনি বলবেন। একত্রিশ তারিখ বাড়ি ছাড়ার কথা। আজ সাত তারিখ। বাড়ি ছাড়ার কোনো লক্ষণ নাই। বাড়ি ভাড়া দেয়ার সাড়াশব্দ নাই। ভাড়া আমার দরকার নাই। বাড়ি ছাড়েন।

শাহেদা শান্ত গলায় বললেন, ছাড়ব তো বটেই। বাড়ি খুঁজছি। পাওয়া গেলেই ছেড়ে দেব।

আমি খোঁজাখুঁজির কথা শুনতে চাই না। বাড়ি ছাড়বেন। আজ রাত্রেই ছাড়বেন।

আজ রাত্রেই ছাড়তে হবে?

অবশ্যই। ভদ্রপাড়ায় বাস করে দুই মেয়ে নিয়ে ব্যবসা করবেন সেটা আর হতে দেয়া যায় না।

আপনি কী বলছেন?

গলা বড় করবেন না। আমি বড় গলার ধার ধারি না। ভদ্রলোকের পাড়ায় বাস করে ব্যবসা করবেন আর আমরা চুপ করে থাকব? ঢাকা শহরে খারাপ পাড়ার তো অভাব নাই, সেখানে গিয়ে ওঠেন। ব্যবসাও ভালো হবে। উঠতি বয়সের দুই মেয়ে!

শাহেদা ভাঙা গলায় বললেন, চুপ করুন। আমি আপনার পায়ে ধরছি। চুপ করুন। আজ রাত্রেই আমি আপনার বাড়ি ছেড়ে দেব। আসুক, মেয়েটা আসুক।

নিজামউদ্দীন হৃষ্ট গলায় বললেন, মেয়ে ট্রিপ দিতে গেছে, এত সহজে কি আসবে? তার আসতে রাত দু'টা-তিনটা বাজবে।

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বলল, চুপ করেন না ভাই, অনেক তো বললেন।

শাহেদা দরজা ধরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর শরীর কাঁপছে। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। বুকের ভেতর প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। মনে হচ্ছে চিৎকার করে উঠলে ব্যথা কমবে।

নিজামউদ্দীন খড়খড়ে গলায় বললেন, আমি যা বলেছি। সত্য কথা বলেছি। যদি মিথ্যা বলি আমার উপর যেন আল্লাহর গজব পড়ে। তারপরেও বলতেছি–রাতটা থাকেন, পরের দিনটাও থাকেন। ব্যাস। পরশুদিন সকালে যেন দেখি বাড়ি পরিষ্কার। ভাড়া বাকি পড়েছে–দেয়া লাগবে না। মেয়ে খাটা পয়সার আমার দরকার নাই।

নিজামউদ্দীন নেমে যাচ্ছেন। যুদ্ধজয়ীর ভঙ্গিতে নামছেন। বৃষ্টির বেগও বাড়ছে। বাড়ির সামনে জড়ো হওয়া লোকজন চলে যাচ্ছে। শাহেদা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। বুকের যন্ত্রণাটা খুব বেড়ে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ঝুমুর এসে ডাকল, মা মা। শাহেদা তাকালেন না। বড়ো বড়ো করে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। মা তুমি বিছানায় এসে শোও।

ঝুমুর মা'র হাত ধরল। শাহেদার ইচ্ছা করল প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে মেয়ের হাত সরিয়ে দেন। কিন্তু তিনি কোনো জোর পাচ্ছেন না। তাঁর শরীর পাখির পালকের মতো হালকা লাগছে। ঝুমুর হাত ধরে তাকে বিছানায় এনে শুইয়ে দিল। কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, মা তুমি এরকম করছি কেন? শাহেদা বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। তার হাত-পা ঘামছে। খুব তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। মেয়েকে পানি এনে দেবার কথা বলতে পারছেন না। জিভ ভারি হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ঘুমাও পাচ্ছে। এই ঘুমাই কি শেষ ঘুম? মেয়েগুলোকে কয়েকটা কথা বলে যেতে চাচ্ছিলেন। বলা বোধহয় সম্ভব হবে না। চোখে আলো লাগছে। তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

আবার যখন চোখ মেললেন তখন করুণ একটা মুখ তার মুখের উপর বুকে আছে। সেই মুখ গভীর মমতায় জানতে চাইল, কেমন আছ মা? চিনতে পারছ না। আমাকে? আমি মিতু।

শাহেদা ক্ষীণস্বরে বললেন, পানি খাব।

মিতু পানির গ্লাস নিয়ে এল। চামচ নিয়ে এল। সে চামচে করে মা'কে পানি খাওয়াতে যাচ্ছে কিন্তু তার হাত এত কাঁপছে যে চামচ থেকে ছলকে পানি পড়ে যাচ্ছে। মিতু কাঁদছে। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কাঁদছে। এত বেশি কাঁদছে যে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। শাহেদা বললেন, কাঁদিস না মা। তিনি মাথা ঘুরিয়ে ঝুমুরকে খুঁজলেন। মিতু বলল, ঝুমুরকে পাঠিয়েছি মবিন ভাইকে আনতে।

কয়টা বাজে?

রাত বেশি হয় নি মা, আটটা।

শাহেদা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আবারো বললেন, কাঁদিস না।

মবিনের ঘরের সামনে ঝুমুর দাঁড়িয়ে আছে। ঘর বন্ধ, তালা ঝুলছে। নিচতলার দরজির দোকান খোলা। সেখান থেকে সেলাই মেশিনের খটখটি শব্দ আসছে। ভয়ে ঝুমুর অস্থির হয়ে গেছে। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। বৃষ্টি পড়ছে। সে দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁসে। মাথার উপর ছাদের মতো একটু আছে বলে বৃষ্টিতে ভিজছে না। তাতে কি? কতক্ষণ

সে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে? সে যে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে তা দরজির দোকানের লোকটি দেখেছে। মেশিন বন্ধ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। ঝুমুরের মনে হচ্ছে সেই লোকটা উপরে উঠে আসবে। একা আসবে না, দু-একজন বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে আসবে।

ঝুমুর এখন কী করবে? বাসায় ফিরে যাবে? বাসায় ফিরে যাবার পথেও তো ঝুমুরকে তারা ধরে ফেলতে পারে। এমন অন্ধকার রাস্তা। তারা যদি রিকশা থামায়। রিকশা থামিয়ে ঝোপঝাড়ের দিকে নিয়ে যায়? চিৎকার করে উঠলে লাভ হবে না। এখনকার সময় এমন যে চিৎকার শুনলে কেউ আসে না। বরং দূরে সরে যায়।

বৃষ্টি জোরে নেমেছে। ঝুমুরের পা ভিজে যাচ্ছে। নিচের সেলাই মেশিনের খটখটি শব্দ এখন আর শোনা যাচ্ছে না। লোকটা নিশ্চয়ই সেলাই মেশিন বন্ধ করে উপরে উঠে আসছে।

ঝুমুরের গা ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছে সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তার যে এত ভয়ঙ্কর বিপদ তা কেউ জানতে পারছে না। দরজির দোকানের লোকটা তাকে কোনো একটা খুপড়ি ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবে–তারপর সারারাত ধরে কুৎসিত কাণ্ডকারখানা করবে। ভোরারাতে গলা টিপে মেরে ফেলে রাখবে ধানক্ষেতে। এই ক্ষেত্রে এরকমই হয়।

বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস দিচ্ছে। ঝুমুর এখন পুরোপুরি ভিজে যাচ্ছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। আসছে, দরজির দোকানের লোকটা আসছে। ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা ঘটতে যাচ্ছে। সে এখন কী করবে? ছাদ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে যাবে? সাহস কি তার আছে? এমনও তো হতে পারে যে দরজির দোকানের লোকটা না মবিন ভাই-ই আসছেন। যদি মবিন ভাই হয় সে প্রথমে আনন্দে একটা চিৎকার দেবে এবং ছুটে গিয়ে মবিন ভাইকে জড়িয়ে ধরবে। এতে মবিন ভাই কিছু মনে করলেও তার কিছুই যায় আসে না।

না, মবিন ভাই না। দরজির দোকানের লোকটা। লম্বা কালো, রোগা একটা লোক। কী বিশ্রীভাবে সে তাকিয়ে আছে! ঝুমুর প্রায় দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল। লোকটা বলল, মবিন সাহেবের খোঁজে আসছেন?

ঝুমুর কোনো উত্তর দিল না। তার শরীর শক্ত হয়ে গেছে।

বৃষ্টিতে ভিজতেছেন। নিচে বসেন। আসেন।

বদমায়েশ লোকটা তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জেনেও ঝুমুর যাচ্ছে। কারণ না গিয়ে সে কী করবে? কী হবে চিৎকার করে?

সাবধানে নামবেন, সিঁড়ি পিছল। ঝুমুর নিশ্চিত হলো সিঁড়ি পিছল এই অজুহাতে লোকটা তার হাত ধরবে। আচ্ছা! ঝুমুর কি পারে না প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে সিঁড়িতে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে? তার জন্যে খুব বেশি সাহস কি লাগে? আচ্ছা আল্লাহ্ কিছু কিছু মানুষকে এত কম সাহস দিয়ে পাঠান কেন? তাকে যদি একটু বেশি সাহস দিয়ে পাঠাতেন। সামান্য বেশি, তাহলে তাঁর এমন কী ক্ষতি হতো?

ঝুমুর দোকানে ঢুকেছে। দোকানে লোকটা একা না। আট-দশ বছরের একটা ছেলেও আছে। সে শার্টের বোতাম লাগাচ্ছে। লোকটা একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, বসেন।

ঝুমুর বসল। না বসে সে কী আর করবে। লোকটা এখন কী করবে ঝুমুর জানে। কোনো একটা অজুহাতে ছেলেটাকে বাইরে পাঠিয়ে দেবে। তারপর দরজা বন্ধ করে দেবে।

মবিন সাহেব বাসাতেই থাকে। আজ যেন কোথায় গেছে। এসে পড়বে।

ঝুমুরকে উদ্দেশ করে কথাগুলো বলা। পরিস্থিতি শুরুতে একটু স্বাভাবিক করা।

চা খাবেন? ঝুমুর হ্যাঁ না কিছু বলল না। লোকটা পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে বলল, ইসমাইল দৌড় দে।

ঝুমুর যা ভেবেছে তাই–ছেলেটাকে সরিয়ে দিচ্ছে। তার ইচ্ছা করল চিৎকার করে বলে খবরদার তুই যাবি না, তুই বসে থাক।

ছেলেটা ছোট একটা কেতলি হাতে উল্কার মতো বের হয়ে গেল। মনে হয় চা-আনার কাজ তার খুব পছন্দ।

মাথাটা মুছে ফেলেন।

লোকটা একটা তোয়ালে ঝুমুরের দিকে বাড়িয়ে ধরেছে। ঝুমুর বলল, মাথা মুছতে হবে না। লোকটা তোয়ালে রেখে দিয়ে সহজ গলায় বলল, ভয় পাবেন না। ভয় পাওয়ার কিছু নাই। মবিন সাহেব আসতে দেরি করলে আমি আপনাকে বাসায় দিয়া আসব।

ঝুমুর যা ভেবেছে তা হচ্ছে না। ছেলেটা চলে যাবার পরও লোকটা দরজা বন্ধ করছে না। বরং ছেলেটার ফেলে যাওয়া শার্টের বোতাম লাগাচ্ছে। শার্টের বোতাম লাগানোর কাজগুলো সাধারণত মেয়েরা করে। ছেলেদের এই কাজ করতে দেখলে একটু অস্বস্তি লাগে।

এই দোকানটা কি আপনার?

না, আমি একজন কর্মচারী।

আপনার বাসা কোথায়?

বাস-টাসা নাই।

রাতে থাকেন কোথায়?

দোকানেই থাকি।

হোটেলে খাই।

ঝুমুর খুব অবাক হচ্ছে। কারণ সে লোকটার সঙ্গে কথা বলছে। আগ্রহ করে কথা বলছে। অবশ্য কথা না বলেই বা কী করবে? দু'জন মানুষ তো চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। তাছাড়া মানুষটাকে তার এখন খুব ভদ্র, খুব বিনয়ী মনে হচ্ছে। ছোট কাজ যারা করে তারাও ভদ্র হতে পারে, বিনয়ী হতে পারে।

ছেলেটা চা নিয়ে এসেছে। তিনটা কাপ বের করল। ছোট ছোট কাপ। কাপের সাইজ যে এত ছোট হতে পারে ঝুমুরের ধারণা ছিল না। তারা তিনজনই চুকচুক করে চা খাচ্ছে। সবচে' বেশি মজা করে চা খাচ্ছে ছোট ছেলেটা। প্রতিবারই চুমুক দিয়ে আহ্ করে উঠছে। বাইরে বৃষ্টির তোড় আরো বেড়েছে। ছোট ছেলেটা দীত বের করে বলল, শহীদ ভাই তুফান আইতাছে। যেন তুফান আসা খুব আনন্দের ব্যাপার। ঝুমুর বলল, আমার মার খুব শরীর খারাপ। এই জন্যে মবিন ভাইকে নিতে এসেছি।

কী হয়েছে?

অজ্ঞান হয়ে গেছে।

জ্ঞান ফেরো নাই?

আমি যখন আসি তখনো ফেরে নাই।

বলেন কী?

ঝুমুরেরও মনে হলো আরো তাই তো! এতক্ষণে একবারও তার মা'র কথা মনে হয়। নি। সে বেশ আরাম করে চা খাচ্ছে। মা কেমন আছে কে জানে। মারা যায় নি তো? ঝুমুর উঠে দাঁড়াল। ক্ষীণস্বলে বলল, আমি চলে যাব।

শহীদ নামের লোকটা বলল, চলুন আমি সঙ্গে যাই।

ঝুমুর কোনো আপত্তি করল না। লোকটাকে তার ভালো লাগছে। বেশ ভালো লাগছে।

শহীদ ঝুমুরকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই ডাক্তার আনতে গেল। এবং মুহুর্তের মধ্যে ডাক্তার নিয়ে এল। ডাক্তার ব্লাডপ্রেসার মাপলেন। প্রেসার কমাবার ওষুধ দিলেন। শহীদ ওষুধ আনতে গেল। ছাতা নেই, ভিজতে ভিজতে গেল।

মিতু বলল, লোকটা কে রে?

ঝুমুর বলল, আমার চেনা একজন।

চেনা মানে কি? কীভাবে চিনিস? পরিচয় হয়েছে কোথায়?

ঝুমুর জবাব দিল না।

মিতু চিন্তিত গলায় বলল, কত দিনের পরিচয়? ঝুমুর বলল, অনেক দিনের।

অনেক দিনের মানে কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ও কি প্রায়ই আসে। নাকি? কথা বলছিস না কেন? কী করে?

শার্টের বোতাম লাগায়।

তুই কি আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস?

ফাজলামি করছি না, যা সত্যি তাই বলছি।

বান্দরের মতো দেখতে একটা লোক, তার সঙ্গে তোর এত খাতির কীভাবে হলো?

তুমি এত রাগছ কেন আপা?

না। আমাকে বল এত খাতির কীভাবে হলো?

তোমার হৈচৈ শুনে মা জেগে যাবে আপা।

মিতু বিস্ময় নিয়ে বোনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঝুমুর বলল, আপা উনি ওষুধ নিয়ে আসার পর উনাকে রাতে খেয়ে যেতে বলি? বেচারা হোটেলে খায়। হোটেলের কুৎসিত খাবার খেয়ে খেয়ে শরীরের কী হাল করেছে দেখেছ?

তুই খুবই আশ্চর্য একটা মেয়ে রে ঝুমুর।

রাতদুপুরে মবিন ভাই যদি এরকম ছোটাছুটি করত তুমি কি তাকে না খাইয়ে বিদেয় দিতে?

মবিন ভাই আর সে এক হলো?

এক ভাবলেই এক।

মিতু তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঝুমুর সেই তীব্রদৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, চারটা চাল বসিয়ে দেব আপা?

যা ইচ্ছা কর।

বেগুন আছে। বেগুন ভেজে ফেলি?

যা ভাজতে ইচ্ছে করে সব ভেজে ফেল।

মিতু অবাক হয়ে দেখল ঝুমুর সত্যি সত্যি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে। মেয়েটা কি পাগল হয়ে গেল?

শহীদ খাবারের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ল। ঝুমুর বলল, না না করলে হবে না, আপনাকে খেয়ে যেতে হবে। গামছাটা দিয়ে ভালোমতো মাথা মুছে ফেলুন।

আমি খাব না। অন্য কোনো দিন এসে...

আপনাকে খেয়ে যেতে হবে। না খেয়ে আপনি যেতে পারবেন না।

শহীদ অস্বস্তিতে মরে যাচ্ছে। মেয়েটার কাণ্ডকারখানা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। মেয়েটা কি পাগল টাইপের?

ঝুমুর বলল, খাবার কিছু নেই–বেগুন ভাজা, ডাল আর আলু ভর্তা। আপনার কষ্ট হবে।

মিতু বলল, উনি খেতে চাচ্ছেন না, তুই এত জোর করছিস কেন?

এত রাতে উনি হোটেলেও কিছু পাবেন না, না খেয়ে থাকবেন নাকি? শহীদ শরমে মরে গিয়ে মিতুর দিকে তাকাল।

মিতু বলল, আপনি খেয়ে যান। ঝুমুর চট করে খাবার দিয়ে দে।

মিতু মা'র ঘরে বসে আছে। দরজা খোলা। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে–মাথা নিচু করে মানুষটা খাচ্ছে। তার সামনে ঝুমুর বসে আছে। সে খাবার তুলে দিচ্ছে। কী যেন আবার নিচু গলায় বলছে। কী বলছে? বলুক যা ইচ্ছা।

শাহেদার ঘুম ভেঙেছে। শাহেদা বললেন, ছেলেটা কে রে?

মিতু বলল, আমি জানি না মা।

শাহেদা বললেন, যার ইচ্ছা আসছে, খেয়ে যাচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছি না মা, কিছুই বুঝতে পারছি না।

তুমি চিন্তা কোরো না মা। আমার মনে হয় না চিন্তার কিছু। তুমি ঘুমিয়ে থাক।

শাহেদা চুপ করে গেলেন। তাঁর চোখ বন্ধ। বন্ধ চোখের কোণা বেয়ে পানি পড়ছে। ঘরে আলো নেই বলে মিতু তা দেখতে পাচ্ছে না।

ঝুমুর চাদরে সারা শরীর ঢেকে শুয়ে আছে। মাথাও চাদরের নিচে ঢুকানো। আজ সে একা ঘুমুবে। মিতু ঘুমুবে মা'র সঙ্গে। ঘুমুতে যাবার আগে সে বোনের ঘরে ঢুকল। বিছানায় বসতে বসতে বলল, ঘুমুচ্ছিস নাকি ঝুমুর?

ঝুমুর জবাব দিল না। মিতু বলল, তুই জেগে আছিস আমি জানি। মুখ থেকে চাদর সরা।

ঝুমুর চাদর সরাল। মিতু বলল, ছেলেটা কে?

জানি না।

জানি না মানে? ওর নাম কি?

শহীদ।

তোর সঙ্গে কত দিনের পরিচয়?

আজই পরিচয় হয়েছে।

সে কী!

মবিন ভাইয়ের বাসার নিচে দরজির দোকানে কাজ করে। আমাকে তাদের ঘরে নিয়ে গেল। চা খাওয়াল।

আর তুই তাকে এরকম খাতির-যত্ন করে দিলি। না জানি সে কী ভাবছে?

ঝুমুর লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসছে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে সে বলল, পরশুদিন সকালে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে আপা।

পরশুদিন আসুক। তখন দেখা যাবে।

তুমি তো আজকের কাণ্ড দেখ নি–আজকের কান্ড দেখলে তোমার আক্কেলগুড়ুম হয়ে যেত।

তোর কাণ্ড দেখে আমার আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেছে।

ঝুমুর মাথা নিচু করে খুব হাসছে। হাসি দেখে মিতুর বড় মায়া লাগল। হঠাৎ সে বলল, আয় তো ঝুমুর তোকে একটু আদর করি। ঝুমুর চোখ তুলে তাকাল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আপাকে জড়িয়ে ধরল।

দু'বোন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে অনেক রাত পর্যন্ত কাঁদল। কেন কাঁদল তারা জানে না।

এক সময় ঝুমুর চোখ মুছে লজ্জিত ভঙ্গিতে ডাকল, আপা!

কি?

আমরা এত কান্নাকাটি করছি কেন?

আমি কী জন্যে কাঁদছি সেটা আমি জানি, তুই কী জন্যে কাঁদছিস সেটা তোর জানার কথা।

আমি জানি না।

না জেনেই ভেউ ভেউ করে কাঁদছিস?

হুঁ। আপা শোন–

বল শুনছি।

পরশু কী হবে বল তো—বাড়িওয়ালা চাচা যখন আসবে তখন তুমি যদি না থাক?

আমি না থাকলে তুই তো থাকবি। তুই সামলাবি।

আমি সামলাব? তুমি কি পাগল-টাগল হয়ে গেলে? কী সব কুৎসিত কথা যে লোকটা বলছিল!

বলুক না। এক সময় বলার কথা শেষ হয়ে যাবে।

লোকজন সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। কুৎসিত কুৎসিত কথা বলবে তখন আমি কী করব?

তুই ঘর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বের হবি। তাতেই কাজ হবে। কিছু মানুষের সিমপ্যাথি পেয়ে যাবি। যদি কাদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাস তাহলে আর দেখতে হবে না। সব লোক তোর পক্ষে চলে আসবে।

কী যে তোমার কথা। আপা!

মিতু হাসতে হাসতে বলল, ইচ্ছা করলে লোকটাকে আমরা কঠিন শাস্তিও দিতে পারি। কীভাবে জনিস?

কিভাবে?

খুব সহজ-কাঁদতে কাঁদতে ছোট্ট একটা অভিনয় করতে হবে। লোকজনের দিকে তাকিয়ে বলতে হবে–যখন তখন আমাদের বাসায় আসত। কখনো পেঁপে নিয়ে আসত, কখনো কলা, কখনো আম নিয়ে আসত। একদিন খারাপ একটা ইঙ্গিত করে। আমরা তাকে ঘর থেকে বের করে দেই। তারপর থেকে সে আমাদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।

করবে। মানুষের চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করে যাই বলা হয় তাই সবাই বিশ্বাস করে।

তুমি বলতে পারবে এমন কথা?

না।

পরশুদিনের কথা ভেবে আমার এমন অস্থির লাগছে!

অস্থির লাগার কিছু নেই। পরশুদিন কেউ আসবে না। আমি ব্যবস্থা করব।

কী ব্যবস্থা করবে? সেটা তোর জানার দরকার নেই। তবে নিশ্চিত থাক। পরশুদিন কেউ আসবে না। কী ব্যবস্থা তুমি করবে। সেটা না জানলে আমি নিশ্চিত হতে পারব না। আমি ঘুমুতে পারব না।

আমার চেনা একজন মানুষ আছে। তাকে জানালেই আর কোনো সমস্যা হবে না।

উনি কি ভয়ঙ্কর কোনো মানুষ?

মোটেই না। আমুদে একজন মানুষ। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর ক্ষমতা।

এরকম মানুষকে তুমি চেন কীভাবে? বেঁচে থাকার জন্যে অনেক” মানুষকে চিনতে হয়। অনেক কুৎসিত কাণ্ডকারখানা করতে হয়।

বেঁচে থাকাটা কি এতই জরুরি?

মিতু ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, মাঝে মাঝে মনে হয় বেঁচে থাকা খুব জরুরি। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় মোটেই জরুরি না।

কখন তোমার কাছে মনে হয় বেঁচে থাকাটা জরুরি?

ঘুম পাচ্ছে–শুয়ে পড়।

না বল–কখন তোমার কাছে মনে হয় বেঁচে থাকাটা জরুরি?

মিতু নিচু গলায় বলল, মাঝে মাঝে শুটিং শেষ হবার পর–অনেক রাতে বাসায় ফিরি। পথে মনে হয় তুই আমার জন্যে বারান্দায় চুপচাপ বসে আছিস। পথে কোনো রিকশা দেখলেই চট করে উঠে দাঁড়াচ্ছিস, তখন বেঁচে থাকাটা খুব জরুরি মনে হয়। মাঝে মাঝে শেষ রাতের দিকে হঠাৎ মনে হয় মা আমার কপালে হাত রেখে দেয়া পড়ছেন, তখন বেঁচে থাকাটা জরুরি মনে হয়। শুধু জরুরি না, অসম্ভব জরুরি মনে হয়।

তুমি আসল কথাটা কিন্তু আপা বল নি। আসল কথাটা এড়িয়ে গেছ।

আসল কথাটা কী?

আমরা কিছু না–মবিন ভাইয়ের কথা তোমার যখনই মনে হয় তখনি বেঁচে থাকাটা তোমার কাছে খুব জরুরি মনে হয়। ঠিক বলেছি না। আপা?

হয়তো ঠিক বলেছিস।

হয়তো না–আমি জানি এটাই আসল সত্য, বাকি সব নকল সত্য।

বয়সের তুলনায় তুই বেশি বেশি জেনে ফেলছিস। জানা ভালো, তবে বেশি জানা ভালো না।

ঝুমুর বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, খুব দুঃখী মানুষেরও বোধহয় বেঁচে থাকা জরুরি মনে হয় তাই না। আপা?

হয় বোধহয়। নয়তো তারা বেঁচে থাকে কেন?

সবাই তো আর বেঁচে থাকে না। কেউ কেউ আবার মরেও যায়। বিষ খায়। গলায় দড়ি দিয়ে সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলে পড়ে। কেন পড়ে?

জানি না কেন?

মবিন ভাইকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিলাম—উনি উত্তর দিতে পারেন নি।

তাকে আবার কখন জিজ্ঞেস করেছিস?

ঐ দিন স্কুল থেকে টিফিন পিরিয়ডে পালিয়ে তাঁর কাছে চলে গেলাম। তাঁর ঘরে কী সুন্দর একটা শীতলপাটি পাতা! আমার সব সময় মনে হয়েছে তার ঘরটায় একা একা হাত-পা ছড়িয়ে শীতলপাটিতে ঘুমুতে পারলে খুব একটা আরামের ঘুম হবে। সেই জন্যে গিয়েছিলাম। তখন প্রশ্নটা করলাম।

মিতু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ঘুমিয়েছিলি?

হুঁ। মবিন ভাই ঘরের ভেতরে আমাকে রেখে তালা দিয়ে ছাত্র পড়াতে চলে গেলেন। সন্ধ্যাবেলা এসে তালা খুললেন। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়েছি। কী শান্তির ঘুম যে ঘুমিয়েছি!

ও আচ্ছা।

তুমি কি রাগ করলে আপা?

না।

কিন্তু তোমার গলার স্বর কেমন কঠিন হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তুমি রাগ করেছ।

পাশের ঘর থেকে শাহেদা ডাকলেন, মিতু, এই মিতু।

মিতু উঠে গেল। ঝুমুর আবার চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে ফেলল। চাদর দিয়ে শরীর ঢাকামাত্র আলাদা একটা জগৎ তৈরি হয়ে যায়। সেই জগতে কত কাণ্ড হয়। আধোঘুম জাগরণে ঝুমুর তার রহস্যময় জগতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এখন সে হয়েছে দারুণ বড়োলোকের এক মেয়ে। ঘর থেকে সে পালিয়ে চলে এসেছে। তাকে খোঁজার জন্যে হুলস্থূল পড়ে গেছে। দু'লাখ টাকা পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খুঁজে পাওয়া যাবে কী করে, সে অতি সাধারণ একটা জায়গায় লুকিয়ে আছে। একটা দরজির দোকানে। দরজির দোকানের কর্মচারীর নাম শাহেদ। সে রাতে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে এক কোণায় রাজকন্যাদের মতো একটা মেয়ে লুকিয়ে আছে। সে ভয় পেয়ে বলল, কে?

ঝুমুর বলল, আমি নীলাঞ্জনা (রাজকন্যার নাম নীলাঞ্জনা চৌধুরী)

আপনি এখানে কেন? আমি কয়েকদিন লুকিয়ে থাকব। আপনি কি আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন না?

আপনার মতো রূপবতী মেয়েকে আমি কোথায় লুকিয়ে রাখব?

লুকিয়ে রাখতে না চান না রাখবেন, শুধু আজ রাতটা থাকতে দিন, আমি ভোরবেলা চলে যাব।

রাতে কোথায় ঘুমুবেন?

কেন আপনার খাটে ঘুমুব। আপনি একদিকে তাকিয়ে ঘুমুবেন, আমি অন্যদিকে তাকিয়ে ঘুমুব। মাঝখানে একটা বালিশ দিয়ে রাখব যাতে গায়ের সঙ্গে গা লেগে না যায়।

আপনি তো ভয়ঙ্কর কথা বলছেন।

আমি মোটেই ভয়ঙ্কর কথা বলছি না। আমি সহজ স্বাভাবিক কথা বলছি।

ঝুমুর নীলাঞ্জনা চৌধুরীর ভূমিকায় অনেক রাত পর্যন্ত অভিনয় করল। তার ঘুম এল শেষ রাতে। তখন মোরগ, ডাকতে শুরু করেছে।

মাগরিবের নামযের পর

মাগরিবের নামযের পর মবিন তার ছাত্রীর বাড়িতে যায়। গরমের দিন বলে সন্ধ্যা ৭টার দিকে আযান পড়ে। সাতটা থেকে নটা–এই দুঘণ্টা একনাগাড়ে পড়ায়। মাঝখানে ইন্টারভ্যালের মতো হয়। ছাত্রী এবং ছাত্রীর মা দু'জন উঠে চলে যান। তখন তার জন্যে চা আসে–লেবু চা। চা খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র ছাত্রী এবং ছাত্রীর মা ঢোকেন। পড়াশোনা শুরু হয়। দেয়াল ঘড়িতে ন'টার ঘণ্টা পড়ামাত্র ছাত্রী প্রথমে ঘড়ির দিকে, তারপর তার মা'র দিকে তাকায় –এর অর্থ পড়া শেষ। দু'জন আবার উঠে চলে যায়।

মবিনের মাঝে মাঝে মনে হয় সে রোবটকে পড়াচ্ছে। যা বলছে লাইলী নামের রূপবতী রোবট তার মেমরি সেলে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। পড়ানোয় রোবটের লাভ কতটুকু হচ্ছে তাও ধরা যাচ্ছে না। এ ধরনের ছাত্রী পড়িয়ে আরাম নেই। তাছাড়া সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। কোনো কারণে রোবটের মর্যাদা বা সম্মান ক্ষুন্ন না হয় সেই ভয়।

একবার একটিভ ভয়েস পেসিভ ভয়েস পড়ানোর সময় মবিন একটু ঝুকে এসে–ছেটেবিলের নিচে তার পা লেগে গেল রোবটের সঙ্গে। রোবট ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল। মুখ তুলে তাকাল মবিনের দিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ঠোঁট কাঁপতে শুরু করছে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি প্রচণ্ড এক চিৎকার দেবে। মবিনের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রোবটের মা টেবিলের নিচে কী হয়েছে বুঝতে পারলেন না। তবে মেয়ের মুখভঙ্গি দেখে কিছু আঁচ করলেন। শঙ্কিত গলায় বললেন, কী হয়েছে রে?

লাইলী চোখ নামিয়ে বলল, কিছু না।

হাঁপ ছেড়ে মবিন আবার পড়াতে শুরু করল। একবার তার ইচ্ছে করল একটা কাগজে ইংরেজিতে লেখে Young lady, that was not intentional–দিকে বাড়িয়ে দেয়। সেই সাহসও হলো না। মেয়েটি যদি কী লেখা হয়েছে না পড়েই প্রেমপত্র লেখা হয়েছে মনে করে চিৎকার দিয়ে ওঠে। চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারলে মবিনের জন্য ভালো হতো। ছাড়া যাচ্ছে না। দুঘন্টা পরিশ্রমে সাত শ' টাকা বেতন প্লাস দুবেলা খাওয়া ভাবা যায় না।

মবিনের ধারণা ছাত্রীর রোবট ভাব এবং ছাত্রীর মায়ের খবরদারি কিছুদিনের মধ্যেই কমে যাবে। যখন দু'জনই লক্ষ করবে এই মাস্টারের উদ্দেশ্য পড়ানো–টেবিলের পা দিয়ে পা চেপে ধরা না, প্রেমপত্র লেখা না।

মবিনের ধারণা মিলছে না–দু'মাস হলো সে পড়াচ্ছে, ছাত্রী এবং ছাত্রীর মা দু'মাস আগে যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে। মবিনকে পড়ানোর সময় হাত-পা খুব সাবধানে রাখতে হয়। সারাক্ষণ মনে হয় সে একটা কচ্ছপ হলে মেয়েটিকে পড়ানো সহজ হতো। হাত-পা খোলসের ভেতর ঢুকিয়ে শুধু মাথাটা বের করে ছাত্রী পড়াত।

প্রকৃতি জীব জগতের নানান 'ফরম' নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মানুষের জন্যে বর্তমান ফরম বেছে নিয়েছে। মানুষের জন্যে কচ্ছপ ফরমটাও খুব খারাপ ছিল না।

মবিন তার ছাত্রীর বাসার বারান্দায় উঠে কলিংবেলে হাত রাখল। এই আরেক বিরক্তিকর ব্যাপার। এ বাড়িতে কলিংবেল টেপার অনেকক্ষণ পর একজন কেউ এসে দরজা খোলে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় অনন্তকাল পার করে দিচ্ছে।

আজ দেরি হলো না। কলিংবেল টেপামাত্র দরজা খুলে গেল। বুড্ডা মাথা বের করে বলল, আফা পড়ব না।

মবিনের ভুরু কুঞ্চিত হলো। গতকালও রোবট পড়তে আসে নি। কেন আসে নি। সেই কারণও দর্শানো হয় নি। রোবটমাতা শুধু বলেছেন–লাইলী আজ পড়বে না। তুমি রাত ন'টার দিকে এসে খেয়ে যেও। মবিন চলে এসেছে। রাত ন'টায় ভাত খাবার জন্যে যায় নি। খাওয়ার জন্যে আবার ফিরে যেতে লজ্জা লাগল। রাতে হোটেলে খেয়ে নিয়েছে। মানুষের অভ্যাস কত দ্রুত বদলায় কাল রাতে সে টের পেয়েছে। হোটেলের খাবার বলতে গেলে কিছুই খেতে পারে নি। যা খেয়েছে তাও হজম হয় নি–পেট নেমে গেছে।

বুড্ডা বলল, আফনেরে বলছে ভাত খাইয়া যাইতে।

তোমার আপা আজো পড়বে না?

জ্বে না।

পড়বে না কেন শরীর খারাপ?

জ্বে।

কী হয়েছে তার?

শইল খারাপ হইছে।

মবিন চলে আসছে। তার মন একটু খারাপ। হোটেলের ভয়ঙ্কর খাবার আজো খেতে হবে। পেট খারাপের ব্যাপারটা মনে হয় স্থায়ী হয়ে যাবে। মবিন গেট পর্যন্ত চলে এসেছে, বুড়া ছুটে এসে বলল, আম্মা আফনেরে ডাকে।

রোবটের মা অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলেন না। মবিনকে আধঘণ্টার মতো বারান্দায় বসে থাকতে হলো। বুডা এসে এক সময় বলল, আফনেরে ভিতরে যাইতে বলছে। মবিন বুডার পেছনে পেছনে ঢুকল। রোবটমাতা বললেন, তুমি কাল খেতে আস নি কেন? লাইলী পড়ুন না পড়ুক তোমার দু'বেলা খাওয়ার কথা, তুমি খাবে।

ওর কী হয়েছে?

গায়ে গোটা গোটা উঠেছে, মনে হয় হাম।

আমি কয়েকদিন আসা বাদ দেব?

বাদ দাও। ও সুস্থ হলে আমি খবর পাঠাব।

জ্বি আচ্ছা। আজ তাহলে যাই? এখনি যাবে কেন? ভাত খাও। ভাত খেয়ে একবারে যাও। ভাত দিতে বলেছি। মবিনের খাওয়ার সময় ভদ্রমহিলা সামনে থাকেন না। আজ রইলেন। কাছে এলেন না–দূরে বসে রইলেন। মবিনের অস্বস্তি লাগছে। দীর্ঘদিন একা একা খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে। মহিলাদের কেউ আশপাশে থাকলে অস্বস্তি লাগে। ভদ্রমহিলা অবশ্যি দূরে বসে আছেন। সেটাও অস্বস্তিকর। মাতৃসম মহিলারা খাবার সময় এত দূরে থাকবেন কেন?

তোমার বাবা-মা কি বেঁচে আছেন?

জ্বি।

কোথায় থাকেন, দেশে?

জ্বি।

বাবা কিছু করেন? স্কুল টিচার ছিলেন। এখন গ্রামেই থাকেন। সামান্য জমিজমা আছে, না থাকার মতোই।

ভাইবোন ক'জন?

ভাই নেই, চার বোন।

বোনদের সব বিয়ে হয়ে গেছে?

দু'জনের হয়েছে।

ব্যক্তিগত সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্যে রাগ করছ না তো?

জ্বি না। আমার কাজের ছেলেটা বলছিল তোমার ঘরে সুন্দরমতো একটা মেয়েকে দেখেছে।

মেয়েটা কে?

ওর নাম মিতু। ওর বড় ভাই আমার সঙ্গে পড়ত।

যে ভাই খুনের জন্যে জেল খাটছে?

মবিন বিরক্ত হলো–মহিলা সব জেনেশুনেই জিজ্ঞেস করছেন মেয়েটা কে? এতসব প্রশ্নের দরকারই বা কি?

সে দরিদ্র প্রাইভেট মাস্টার। পড়াতে এসেছে, পড়িয়ে চলে যাবে। ব্যাস।

ঐ মেয়ে কি তোমার কাছে প্রায়ই আসে?

জ্বি।

মেয়েটা কী করে।

সিনেমার ছোটখাটো রোল করে।

এতেই ওদের সংসার চলে?

চলে আর কোথায়? কোনোমতে জীবন ধারণ করা।

তিনজনের সংসার, বাড়ি ভাড়া, বোনের স্কুলের খরচ সব মেয়ের সামান্য রোজগারে চলে?

চালাতে হয়।

আমি মেয়েটার নামে অনেক আজেবাজে কথা শুনি। দামি দামি গাড়ি নাকি মাঝেমধ্যে নামিয়ে দিয়ে যায়।

মবিনের খাওয়া হয়ে গেছে। সে হাত ধোয়ার জন্যে উঠল। ভদ্রমহিলা নিজেও উঠে দাঁড়ালেন। উপদেশ দিচ্ছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, এ জাতীয় মেয়েদের সাথে সম্পর্ক না রাখাই ভালো।

মবিন কঠিন কিছু কথা বলতে গিয়েও বলল না। কী হবে কঠিন কথা বলে?

আমি তাহলে যাই?

বোস। আরেকটু বোস। তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে। খুব জরুরি।

মবিন বিস্মিত হলো। তার সঙ্গে এই মহিলার কী জরুরি কথা থাকতে পারে? টেবিলের নিচে একবার তার রোবটকন্যার পায়ের সঙ্গে তার পা লেগে গিয়েছিল–এই খবরটা কি মেয়ে তার মা'কে জানিয়েছে?

এই ঘরে না, পাশের ঘরে আস। এই ঘরে লাইলীর বাবার কাছে বাইরের লোকজন আসে।

মবিন পাশের ঘরে গেল। এটা মনে হচ্ছে গেষ্টরুম। সুন্দর করে সাজানো। আলনা খালি দেখে মনে হয়। কেউ থাকে না। বোস, তুমি চেয়ারটায় বোস। মবিন অস্বস্তির সঙ্গে বসল। ভদ্রমহিলা দরজা ভিজিয়ে দিয়ে মবিনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। গলার স্বর নিচু করে

বললেন, কাজের ছেলেটা যে দুপুরে তোমার জন্যে খাবার নিয়ে যায়–লাইলী কি ঐ ছেলের হাতে তোমাকে কোনো চিঠি পাঠিয়েছে?

মবিন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। ভদ্রমহিলা বিষন্ন গলায় বললেন, সত্যি কথা বল। আমি খুব অশান্তিতে আছি।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ও শুধু শুধু আমাকে চিঠি লিখবে কেন?

লেখে নাই তাহলে?

জ্বি না।

আচ্ছা তুমি যাও।

সমস্যাটা কী হয়েছে আপনি কি বলবেন?

না, সমস্যা কিছু না।

আমার কারণে কোনো সমস্যা হয়ে থাকলে আমাকে বলে দিন।

বললাম তো কোনো সমস্যা হয় নি। আপনার যদি মনে হয় লাইলীকে পড়াতে না এলে ভালো হয়–তাহলে আমি কাল থেকে আসব না।

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আচ্ছা তাহলে তুমি বরং এস না।

জ্বি আচ্ছা।

আমি শুনেছি তুমি চাকরি খুঁজছ, পাচ্ছো না। আমি লাইলীর বাবাকে বলে দেব। যদি কিছু করতে পারে। ওর তো অনেক জানাশোনা।

তার কোনো দরকার নেই। আমি তাহলে যাই?

দাঁড়াও একটু, তোমার বেতনটা দিয়ে দিই।

মবিন বেতনের অপেক্ষায় বসে রইল। মাস এখনো শেষ হয় নি। দশদিন বাকি। মবিনকে তিনি খামে করে পুরো সাত শ টাকা দিয়ে গেলেন। মবিনের এত খারাপ লাগছে বলার নয়। তার ইচ্ছা করছে টাকাটা রেখে চলে আসতে। সেটা বড় ধরনের অভদ্রতা হয়। সেই অভদ্রতা করার অধিকার তার নেই। তারচেয়ে বড় কথা-সাত শ টাকা তুচ্ছ করার মতো মনের জোরাও তার নাই। সাত শ টাকা অনেক টাকা।

সন্ধ্যাবেলা এখন আর তার কিছু করার নেই। একটা টিউশনি ছেড়ে দিয়ে এইটা নিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে একুল ওকুল দু'কূলই গেছে।

চিঠির ব্যাপারটাও বেশ রহস্যময়। এই মেয়ে তাকে চিঠি লিখবে এ জাতীয় উদ্ভট চিন্তা ভদ্রমহিলা কেন করছেন? এতটা সন্দেহ বাস্তিকগ্রস্ত হলে চলবে কীভাবে?

মবিনের নিজের কুঠুরিতে ফিরতে ইচ্ছা করছে না। কী হবে সেখানে গিয়ে? শীতলপাটির বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকবে? বালিশের নিচে রাখা মা'র চিঠিটা দ্বিতীয়বার পড়বে?

বাবা মবিন,

আমার দোয়া নিও। দীর্ঘদিন তোমার পাত্রাদি পাইতেছি না। তোমার বাবার চোখের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছে। ডাক্তার দেখাইয়াছি। তাহার অভিমত অতি সত্ত্বর ঢাকা নিয়া চিকিৎসা না করাইলে চক্ষু নষ্ট হইবে। এখন তোমার বিবেচনা।

তুমি সংসারের হল অবস্থা জানা। জানিবার পরও তোমার কোনো পরিবর্তন নাই। ইহাতে আমি এবং তোমার বাবা দু'জনই মর্মাহত। গত মাসে মাত্র পাঁচ শ টাকা পাঠাইয়াছ। অথচ তুমি জানা জোছনার সন্তান হইবে। সে এই কারণে বাবা-মা'র কাছে আসিয়াছে। আমি কোন মুখে জামাইয়ের নিকট হাত পাতিয়া আমার মেয়ের সন্তান প্রসবের খরচ নেই? তোমার কারণে জামাইয়ের কাছে মাথা হেঁট হইয়াছে। যাহা হউক শুনিয়া খুশি হইবে জোছনার পুত্র সন্তান হইয়াছে। জামাই অত্যন্ত খুশি হইয়াছে। নাতির মুখ দেখিয়া আমি কিছু দিতে পারি নাই। এই লজ্জা রাখবার আমার জায়গা নাই। তুমি অতি অবশ্যই একটি সোনার চেইন খরিদ করিয়া পঠাইবার ব্যবস্থা করিবে।

আল্লাহপাকের দরবারে সর্বদাই তোমার মঙ্গল কামনা করি।

দোয়াগো–

তোমার মা।

মবিন রাত আটটা পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় হাঁটল। তারপর রওনা হলো মিতুদের বাড়ির দিকে।

তার মন বেশি রকম খারাপ হয়েছে। মিতুকে না দেখলে মন ভালো হবে না।

মিতু বাসায় ছিল না।

ঝুমুর হাসিমুখে বলল, আপা রাতে ফিরবে না। আপার সঙ্গে দেখা করতে হলে সারারাত থাকতে হবে। আপা ভোর রাতের দিকে চলে আসবে। ভালোই হয়েছে, আসুন আমরা সারারাত গল্প করে কাটিয়ে দেই। আপনার কি শরীর টরীর খারাপ করেছে মবিন ভাই? কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে!

চা খাওয়াতে পারবে?

অবশ্যই পারব। চিনি এবং চা পাতা ছাড়া চা বানাতে হবে। দু'টাই নাই।

তুমি পানি গরম করতে দাও, আমি নিয়ে আসছি।

আপনি কি জানেন মবিন ভাই দুদিন আগে যে রাতদুপুরে আপনার খোঁজে গিয়েছিলাম?

জানি না তো।

তা জানবেন কেন? আপনি কি আমাদের খোঁজ নেন? খোঁজ নেন না। আমরাই যখন তখন আপনার কাছে ছুটে যাই। মা'র শরীর হঠাৎ খুব খারাপ করেছিল। তখন আপনাকে আনতে গিয়েছিলাম।

কী হয়েছিল?

সে এক লম্বা গল্প, আপনার শুনতে অনেক সময় লাগবে। চা পাতা আর চিনি নিয়ে আসুন, তারপর আপনাকে বলব। আপনার রাতের খাওয়া কি হয়ে গেছে মবিন ভাই?

না।

খুব ভালো হয়েছে, রাতে আমার সঙ্গে খাবেন। আমি আপনাকে রান্না করে খাওয়াব। ঘরে অবশ্য রান্নারও কিছু নেই। আপনাকে ডিমও কিনে আনতে হবে।

আর কিছু লাগবে?

না। আর কিছু লাগবে না। আপনি কিন্তু বেশি দেরি করতে পারবেন না–যাবেন আর আসবেন।

আচ্ছা।

চলুন রাস্তা পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিই। আপনাকে একটা গোপন খবর বলি মবিন ভাই। কাউকে কিন্তু বলবেন না। আপা যদি জানে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

খবরটা কী?

গতকাল থেকে আমাদের টেস্ট পরীক্ষা হচ্ছে। আমি পরীক্ষা দিচ্ছি না। পরীক্ষা দিয়ে তো গোল্লাই খাব। কী দরকার সেধে গোল্লা খাবার?

ঝুমুর খিলখিল করে হাসছে। ঝুমুরের হাসিও মিতুর মতো। হাসলে ঝনঝন শব্দ হয়। মবিনের হাসি শুনতে ভালো লাগছে।

মোবারক সাহেবের কুঁড়েঘর

জয়দেবপুর থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে মোবারক সাহেবের একটা কুঁড়েঘর আছে। লোকে বাসাবাড়ি তৈরি করে; তিনি কুঁড়েঘর বানিয়েছেন। আক্ষরিক অর্থেই কুঁড়েঘর। তিনি একর জমি নিয়ে ছোট্ট মাটির ঘর। খড়ের ছাদ।

আধুনিক কুঁড়েঘরের এক ফ্যাশন ইদানীং চালু হয়েছে। মাটির দেয়াল, খড়ের ছাদের ভেতর থাকে কার্পেট। এয়ারকুলার বিজবিজ করে চলে। বাথরুম হয় মার্বেল পাথরের। কুঁড়ে ঘর নিয়ে এক ধরনের রসিকতা।

মোবারক সাহেব তা করেন নি। তার ঘরে বড় একটা চৌকি পাতা। চৌকির উপর হোগলার পাটি–মাথার নিচে দেয়ার জন্যে শক্ত বালিশ। এ বাড়িতে কোনো টেলিফোন নেই। তিনি ইলেকট্রসিটিও আনেন নি। সন্ধ্যার পর হারিকেন জ্বলে।

দর্শনীয় কোনো বাগানও করা হয় নি। কেনার সময় গাছগাছড়া যা ছিল এখনো তাই আছে। তিনি শুধু তাঁর জমিটা কংক্রিটের পিলার এবং শক্ত কাটা তারের বেড়া দিয়ে আলাদা করেছেন। বাড়ির গেটে পাহারাদার আছে।

বছরে দু'একবার শুধু রাত কাটাতে আসেন। রাত নটা-দশটার দিকে এসে ভোরবেলা চলে যান। একাই আসেন। পাহারাদার দু'জন গেটে তালা দিয়ে চলে যায়।

আজ একা আসেন নি। মিতুকে সঙ্গে এনেছেন। পাজেরো জিপ তাদের নামিয়ে চলে গেছে। মোবারক সাহেব গেটের দারোয়ান দু'জনকেও চলে যেতে বলেছেন। তারা এখনো যায় নি। মোবারক সাহেবের মালপত্র ঘরে ঢুকিয়ে গেটে তালা দিয়ে তারা যাবে। রাতটা থাকবে জয়দেবপুরে। ভোরবেলা এসে গেটের তালা খুলবে।

মিতু হকচাকিয়ে গেছে। তার চারদিকে ঘোর অন্ধকার। জোনাকি পোকা জ্বলছে-নিভছে। আলো বলতে জোনাকি পোকার আলো।

মোবারক সাহেব হালকা গলায় বললেন, ভয় লাগছে?

মিতু বলল, না। ভয় লাগার কিছু আছে কি?

সাপ আছে। বর্ষাকাল তো–খুব সাপের উপদ্রব।

মোবারক সাহেবের হাতে ছোট একটা পেনসিল টর্চ। টর্চ ছোট হলেও আলো তীব্র। তিনি আলো ফেললেন। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে রাস্তা। জায়গায় জায়গায় পানি জমে আছে। সেখানে ইট বিছানো। মোবারক সাহেব টর্চ নিভিয়ে ফেললেন–ঘন অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেল।

দারোয়ান দু'জন জিসিনপত্র রেখে চলে এসেছে। কুঁড়েঘরে আলো জ্বেলে এসেছে। জানালা দিয়ে ক্ষীণ আলোর রেশ দেখা যাচ্ছে।

মোবারক সাহেব টর্চটা মিতুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তুমি চলে যাও। আমি ওদের বিদেয় করে আসছি। মোবারক সাহেব ভেবেছিলেন মিতু বলবে–আমার একা যেতে ভয় লাগছে। আমি অপেক্ষা করি। দু'জন একসঙ্গে যাব। মিতু তেমন কিছু বলল না। টর্চ হাতে এগিয়ে গেল।

তিনি দারোয়ানদের বিদেয় করলেন। গোটে তালা দিয়ে চাবি নিজের কাছে নিয়ে নিলেন। পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন সিগারেট আছে কিনা। সিগারেট আছে। কয়েকদিন হলো সিগারেট বেশি খাওয়া হচ্ছে। তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। আকাশ মেঘলা বলে তারার আলো নেই। চাঁদ উঠবে রাত তিনটার দিকে। কাজেই রাত তিনটা পর্যন্ত এমন ঘন অন্ধকার থাকবে। ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে না। এই অঞ্চলের ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক বিখ্যাত। এরা ডাকা বন্ধ করেছে এর অর্থ হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি শুরু হবে। বৃষ্টি শুরুর আগে আগে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাক বন্ধ করে দেয়। জোনাকি পোকারাও তাদের আলো নিভিয়ে ফেলে। জোনাকি পোকারা অবশ্যি তাদের আলো এখনো নিভায় নি। কাজেই বৃষ্টি শুরু হতে একটু দেরি আছে। এইসব তথ্য তিনি তাঁর কুঁড়েঘরে রাত্রি যাপন করে শিখেছেন।

তাঁর শেখার ক্ষমতা ভালো। তিনি দ্রুত শিখতে পারেন। তার পর্যবেক্ষণ শক্তিও ভালো। লেখালেখির ক্ষমতা থাকলে তিনি ভালো লেখক হতে পারতেন।

সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। তবু তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। মেয়েটি ঘরের ভেতর কী করছে কে জানে। তার কি উচিত না উদ্বিগ্ন হয়ে একবার বারান্দায় এসে দাঁড়ানো? মেয়েটি তাঁকে পছন্দ করছে না। কিন্তু একদিন করবে। অবশ্যই করবে। মেয়েটির শরীর তিনি কিনে

নিয়েছেন। আত্মা শরীরেই বাস করে। একদিন সেই আত্মাও তিনি কিনতে পারবেন। বেঁচে থাকার জন্যে একটি শুদ্ধ ও সুন্দর আত্মার তাঁর খুব প্রয়োজন।

তিনি আকাশের দিকে তাকালেন–তারা দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টি নামবে। আজ রাতে কোনো এক সময় ঘনবর্ষণ হবে। ঠিক কখন হবে তা বলা যাচ্ছে না। মানুষকে সেই ক্ষমতা দেয়া হয় নি। সেই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে মানুষের চেয়ে অনেক নিম্নশ্রেণীর পশুপাখিকে, কীটপতঙ্গকে। গাছদের কি দেয়া হয়েছে? অবশ্যই দেয়া হয়েছে। তার ধারণা, প্রতিটি গাছ জানে কখন বৃষ্টি হবে। তাঁর এই বাগানবাড়ির প্রতিটি গাছ অপেক্ষা করছে...।

সরসর শব্দ করে তাঁর ডান দিকের ঝোপে কী যেন চলে গেল। সাপ হতে পারে। বৃষ্টির আগে আগে তারা জায়গা বদল করে নিচ্ছে। বৃষ্টির পানিতে যখন সাপের গর্ত ভর্তি হয়ে যায় তখন তারা কী করে? তারা নিশ্চয়ই বৃষ্টির পানিতে ডুবে বসে থাকে না?

মোবারক সাহেব ঘরের দিকে এগোলেন। টর্চলাইটটা হাতে থাকলে হতো। অন্ধকারে কোথায় পা ফেলতে কোথায় ফেলছেন কে জানে। এক জায়গায় পানি জমে ছিল। তিনি পানিতে পা ফেলে পায়ের পাতা ভিজিয়ে ফেললেন।

কুঁড়েঘরের বারান্দায় বড়ো বালতি ভর্তি পানি। পানির উপর মগ ভাসছে। একপাশে সাবানদানিতে সাবান। তিনি উঠানে উঠে সহজ স্বরে ডাকলেন, মিতু হারিকেন নিয়ে এস তো।

মিতু হারিকেন হাতে পাশে এসে দাঁড়াল।

মগে করে আমার পায়ে পানি ঢাল। কাঁদায় পা দিয়ে ফেলেছি।

মিতু পানি ঢালছে। মোবারক সাহেব বললেন, আমার বাগানবাড়ি পছন্দ হয়েছে?

হয়েছে।

মনে হচ্ছে না জায়গাটা পৃথিবীর বাইরে?

মিতু জবাব দিল না। মোবারক সাহেব বললেন, আমার মাঝে মাঝে একা থাকতে ইচ্ছা করে, তখন এখানে আসি।

আজ তো একা আসেন নি।

না, আজ অবশ্যি একা আসি নি। এখানে এক রাত্রি যাপন করতে কেমন লাগে তা আমি জানি। দুজনে কেমন লাগে তা জানি না। এই জন্যেই তোমাকে নিয়ে এসেছি। দু'জনে মিলে অন্ধকার দেখব, ইন্টারেস্টিং সব গল্প করব। আমি অসংখ্য অদ্ভুত গল্প জানি। সবচে' বেশি জানি ভূতের গল্প। ভূতের গল্প তোমার কেমন লাগে?

ভালো লাগে।

মোবারক সাহেবের হাত-মুখ ধোয়া শেষ হয়েছে। তিনি কিছু বলার আগেই মিতু ঘরের ভেতর চলে গেল। তোয়ালে এনে হাতে দিল। তিনি তোয়ালে দিয়ে হাত-পা মুছলেন।

বারান্দায় কিছুক্ষণ বসা যাক কী বল মিতু।

আপনি যা বলবেন তাই হবে। কোথায় বসব? চেয়ার তো নেই।

ঘরের ভেতর মাদুর আছে। তুমি খুঁজে পাবে না, আমি নিয়ে আসছি।

মোবারক সাহেব নিজেই মাদুর এনে বিছিয়ে দিলেন। শান্ত স্বরে বললেন, পুরোপুরি অন্ধকার হলে ভালো লাগত। কিন্তু আলো কিছু রাখতেই হবে–নয়তো সাপ উঠে আসবে। একবার কী হয়েছে শোন–একা একা বারান্দায় বসে আছি। চারদিক অন্ধকার, ঘরের বাতিও নেভানো। পা মেলে বসে অন্ধকার দেখছি। হঠাৎ ভারি কী যেন পায়ের উপর উঠে গেল। পায়ে যে সাপ উঠে গেছে সেটা বুঝতে বুঝতে সাপ নেমে গেল। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার, কিন্তু মনে হয় অনন্তকাল। তুমি বোস, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

মিতু বসল। মোবারক সাহেব বললেন, আরাম করে বোস।

আমি আরাম করেই বসেছি।

তুমি গান জান?

জ্বি না।

ভালো টিচার রেখে গান শেখার ব্যবস্থা করে দেব। তোমার গলা ভালো। গান ভালোই গাইবে। তাছাড়া নাচ-গান এইসব ভালোমতো জানা তোমার নিজের স্বার্থেই দরকার। ছবির জগতের প্রধান নায়িকা নাচ-গান না জানলে চলে? আমি যে একটা ছবি বানাচ্ছি সেটা কি তুমি জান?

জ্বি শুনেছি।

সেই ছবির তুমিই প্রধান নায়িকা এটা শুনেছ?

আঁচ করতে পারছি।

তোমার ভালো লাগছে না?

চারদিকের বিপুল গাঢ় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মিতু বলল, ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে।,

কোমল সেই হাত

প্রায় এক ঘণ্টার মতো হলো মবিন এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছে। চিঠি যখন পড়েছে তখন ঘরে দিনের আলো ছিল। এখন অন্ধকার। মবিন আলো জ্বলে নি। অন্ধকার ঘরেই বসে আছে। তার চারদিকে পিনপিন করছে মশা। মশা তাড়াবার স্বাভাবিক ইচ্ছাটাও হচ্ছে না।

অবিশ্বাস্য এবং অকল্পনীয় একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। সিলেটের চা বাগানের এক ব্রিটিশ মালিক খোদ ইংল্যান্ড থেকে জানাচ্ছেন–তাকে লাক্কা টি গার্ডেনের ম্যানেজারের নিয়োগপত্র দেয়া হচ্ছে। এক বছরের ট্রেনিং পিরিয়ডের পর চাকরি স্থায়ী হবে। ট্রেনিং পর্ব দুভাগে বিভক্ত। প্রথম চার মাস ট্রেনিং হবে শ্রীলঙ্কার 'ইয়ালো বিং টি গার্ডেন'। পরের আট মাস ইংল্যাণ্ডে।

ট্রেনিং পিরিয়ডের ভাতা উল্লেখ করা আছে। অঙ্কটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। পোশাক পরিচ্ছদ এবং প্যাসেজ মানির জন্যে চেস ম্যানহাটন ব্যাংকের ইসুয করা একটি ব্যাংক ড্রাফট চিঠির সঙ্গে আছে। পাউন্ড স্টারলিঙে যে অঙ্ক সেখানে বসানো তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

চা বাগানের চাকরির চেষ্টা সে করেছিল। ইন্টারভ্যু দিতে চিটাগাং পর্যন্ত গিয়েছিল। যাওয়া-আসার ভাড়া মিতু দিয়েছিল। সেই চাকুরি ছোট একটা চাকুরি। অন্য চা বাগান। এই যোগাযোগ কী করে হলো মবিন বুঝতে পারছে না। ইন্টারভ্যু বোর্ডের কেউ কি তার জন্যে সুপারিশ করেছেন? রহস্যটা কি?

মবিনের হতভম্ব ভাব কিছুতেই কাটছে না। চেস ম্যানহাটন ব্যাংকের ড্রাফটটা সঙ্গে না থাকলে ভাবত কেউ রসিকতা করছে। মানুষ নির্মম রসিকতা মাঝে মধ্যে করে।

এখন সে কী করবে? আনন্দ প্রকাশের জন্যে কিছু একটা করা উচিত। কাকে খবরটা প্রথম দেয়া যায়? মিতুকে তো বটেই। যদিও তার ইচ্ছা হচ্ছে একটা মাইক ভাড়া করে গাজীপুর শহরে রিকশায় ঘুরে ঘুরে খবরটা বলে বেড়ায়।

এ রকম একটা খবর মিতুকে খালি হাতে জানানো যাবে না। এক লাখ গোলাপ কিনতে পারলে এক লাখ গোলাপ নিয়ে মিতুর কাছে যাওয়া যেত। কত দাম এক লাখ গোলাপের?

মিতু খবরটা শুনে কী করবে? কী করবে। মবিন আন্দাজ করতে পারে। চট করে উঠে দাঁড়াবে, তারপর ছুটে সামনে থেকে চলে যাবে। কাঁদার জন্যে যাবে। মিতু তার সামনে কাঁদতে পারে না। অনেকক্ষণ পর সে ফিরে আসবে। খুব স্বাভাবিক আচরণ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু স্বাভাবিক হতে পারবে না। মিতুর ধারণা অভিনেত্রী হিসেবে সে খুব বড়ো। আসলে বড়ো না। আসলে সে কাঁচা অভিনেত্রী। আবেগ লুকাতে পারে না।

না মিতুকে খবরটা এভাবে দেয়া যাবে না। মজা করে দিতে হবে। মুখ শুকনো করে তার কাছে যেতে হবে। বেশ রাত করে। মিতু উদ্বিগ্ন হয়ে বলবে, কী ব্যাপার এত রাতে? তখন সে বলবে, ঘরে কোনো খাবার আছে মিতু? সারাদিন খাই নি। হাত একেবারে খালি। লজ্জায় আসতেও পারছিলাম না। এটা শুনে মিতুর মুখ ছাইবর্ণ হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পানি এসে যাবে এবং সে দৌড়ে সামনে থেকে চলে যাবে। আধঘণ্টা পর এসে বলবে, এস খেতে এস। এমনভাবে বলবে যেন কিছুই হয় নি।

মা'কে একটা চিঠি লিখতে হবে। আজ রাতেই চিঠি লিখতে হবে।

মা,
আমার সালাম নিও।
তোমার চিঠি পেয়েছি। নানান ঝামেলায় ব্যস্ত ছিলাম বলে। উত্তর দিতে দেরি হলো। জোছনার ছেলে হয়েছে শুনে খুব খুশি হয়েছি। ওকে আমার অভিনন্দন দিও। বাবার চোখের খবর শুনে উদ্বিগ্ন বোধ করছি। আমার উচিত নিজে গিয়ে বাবাকে নিয়ে আসা। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। চা বাগানের ম্যানেজারের একটি চাকরি পেয়েছি। প্রাথমিক ট্রেনিঙে আমাকে শ্রীলঙ্কা এবং পরে ইংল্যান্ডে যেতে হবে। ভিসা এবং অন্যান্য ব্যাপারে খুব ব্যস্ততা যাচ্ছে। যাই হোক, আমি টাকা পাঠাচ্ছি। তুমি বাবাকে নিয়ে চলে এস, আমি এখানে ভালো একটা হোটেল ব্যবস্থা করে রাখব। তোমরা ঢাকায় আসার পর বাবাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটির কাজগুলো মিতু করবে। মিতু হচ্ছে রফিকের বোন। ঐ যে একবার রফিককে নিয়ে এসেছিলাম। বাঁশি বাজিয়ে যে সবাইকে হতভম্ব করে দিয়েছিল।
মিতু খুবই চালাকচাতুর মেয়ে। সে তোমাদের কোনো অসুবিধাই হতে দেবে না। আমি যখন দেশের বাইরে থাকব। তখনো সে-ই তোমাদের দেখাশোনা এবং খোঁজখবর করবে। তোমরা কবে নাগাদ আসবে। আমাকে টেলিগ্রাম করে জানিও। ভালো কথা, জোছনার ছেলের জন্যে সোনার চেইন, জোছনার জন্যে ভালো একটা শাড়ি কেনার জন্যে আলাদা করে টাকা পাঠালাম। তোমরা ভালো থেক। বাবাকে আমার সালাম দিও...

ঘর অন্ধকার করে বসে আছ কেন?

মবিন দারুণ চমকে উঠল। মিতু দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। মনে হয় অনেকক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে আছে। মবিন উঠল। বাতি জ্বালাল। অদ্ভুত গলায় বলল, ভেতরে এস মিতু।

মিতু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, অন্ধকারে মূর্তির মতো বসে কী করছিলে?

চিঠি লিখছিলাম?

চিঠি লিখছিলে মানে?

মনে মনে লিখছিলাম। মনে মনে চিঠি লিখতে কাগজ, কলম, আলো কিছুই লাগে না। মনে মনে লেখা চিঠিতে কোনো বানান ভুলও হয় না।

কী হয়েছে তোমার বল তো?

অদ্ভুত একটা চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা রেজিস্ট্রি ডাকে ইংল্যান্ড থেকে এসেছে।

খারাপ কিছু?

ভয়ঙ্কর খারাপ। নাও পড়। মিতু চিঠি পড়ছে। মনিব একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিতুর দিকে। সে যা ভেবেছে তাই। মিতুর চোখে পানি এসে গেছে। সে আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। ধরা গলায় বলল, দশ হাজার পাউন্ড স্ট্যার্লিং মানে কত টাকা?

ষাট দিয়ে গুণ দাও। গুণ দিলেই বেরিয়ে পড়বে।

তোমার হাতে তো একদম সময় নেই।

মবিন উদ্বিগ্ন গলায় বলল, ছোটাছুটি করতে করতে জান বের হয়ে যাবে। শোন তোমাকে আগেভাগে বলে রাখছি, যাবতীয় ছোটাছুটিতে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। সিনেমা টিনেমা বাদ দাও। তুমি অনেক কষ্ট করেছ। আর কষ্ট করতে হবে না।

আর কষ্ট করতে হবে না?

অবশ্যই না। আজ এই মুহুর্ত থেকে তোমার যাবতীয় কষ্টের অবসান হলো, ঝুমুরকে নিয়ে বা তোমার মা'কে নিয়েও তোমার চিন্তা করতে হবে না।

সব চিন্তা তোমার?

অবশ্যই। বিয়ের ব্যাপারটা এক সপ্তাহের মধ্যে সেরে ফেলব। বাবা চোখ দেখানোর জন্যে ঢাকা আসবেন, মাও আসবেন। ঝুমুর আছে, তোমার মা আছেন–আমরা আমরাই, বাইরের কাউকে বলার কোনো দরকার নেই। বাইরের কেউ তো নেইও। তুমি যদি তোমার ফিল্ম লাইনের কাউকে বলতে চাও বলবে।

টেপীকে বলব?

মিতু এমনভাবে প্রশ্ন করল যে মবিন চমকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। মিতু হাসল। সহজভাবেই হাসল। সেই হাসিতেও কিছু একটা ছিল। মবিন চোখ ফেরাতে পারল না। মিতু বলল, তোমার জন্যে সিগারেট এনেছি। নাও।

মবিন হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিতে নিতে অস্পষ্ট গলায় বলল, মিতু তুমি হঠাৎ করে টেপীর কথা তুললে কেন?

মিতু শান্ত স্বরে বলল, তোমার এত বুদ্ধি। তারপরেও একটা সাধারণ ব্যাপার ধরতে তোমার এত সময় লাগল কেন?

মবিন সিগারেট ধরাল। তার হাত কাঁপছে। তার চোখ-মুখ ফ্যাকাসে। মিতু বলল, আমার ধারণা টেপীকে তুমি অনেক আগেই ধরেছ। তারপরেও না ধরার ভান করে গেছ। নিজের সঙ্গে ভান। নিজেকে প্রতারণা। তাই না?

মবিন কিছু বলল না।

মিতু বলল, এখন বল। আমার দিকে তাকিয়ে বল, এখন কি তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারবে?

পারব।

সত্যি পারবে?

অবশ্যই পারব।

মিতু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমারও মনে হয় তুমি পারবে। কিন্তু বিয়েটা ভালো হবে না। যতবারই আমাকে জড়িয়ে ধরবে ততবারই মনে হবে–আরো অনেকে এই ভঙ্গিতেই আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। মনে পড়বে না?

না।

ছেলেমানুষের মতো কথা বলবে না তো মবিন ভাই। তুমি ছেলেমানুষ না। তুমি এখন চোখ-কান বন্ধ করে আমাকে বিয়ে করবে। তার পেছনে ভালোবাসা অবশ্যই আছে। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতাবোধও আছে। আমি তোমার দুঃসময়ে তোমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছি। সেই কৃতজ্ঞতাবোধ। ঠিক কিনা বল?

মবিন চুপ করে রইল। তার হাতের সিগারেট নিভে গেল। মিতু হালকা গলায় বলল, দু'জনের জীবন নষ্ট করে তো লাভ নেই। একজনেরটাই নষ্ট হোক। একজন টিকে থাক। তুমি খুব ভালো দেখে একটা মেয়েকে বিয়ে কর। তুমি সুখে আছ, আনন্দে আছ–এই দৃশ্য দূর থেকে দেখলেও আমার ভালো লাগবে। একদিন হয়তো তোমার চা বাগানে বেড়াতে যাব। তোমার বাংলোতে বসে তোমার সঙ্গে এককাপ চা খাব। তোমার স্ত্রী, তোমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে ছবি তুলব। সেই আনন্দও কম কি?

মিতুর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে বলল, মবিন ভাই তোমার কাছে রুমাল আছে, দাও রুমাল দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দাও। আমি এখন চলে যাব।

মবিন সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। হালকা পায়ে নেমে যাচ্ছে মিতু। সে মাথার উপর শাড়ির আঁচল টেনে দিয়েছে। তাকে কেমন বউ বউ লাগছে। চারদিকের বিপুল অন্ধকারে মিশে যাবার জন্যে নেমে যাচ্ছে অপূর্ব একটি মেয়ে। তাকে কি এইভাবে নেমে যেতে দেয়া উচিত?

মবিন কঠিন গলায় ডাকল, মিতু দাড়াও। কোথায় যাচ্ছ তুমি? উঠে এস। উঠে এস বললাম।

মবিন এখন পর্যন্ত কোনোদিন মিতুর হাত ধরে নি। তার খুব লজ্জা লাগে। এই প্রথম লজ্জা ভেঙে সে মিতুর হাত ধরল। আহ্ কী কোমল সেই হাত!